স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী
৩য় বর্ষ ❑ পঞ্চম সংখ্যা ❑ জুন-জুলাই ২০১৪

সম্পাদক
ডা. পুণ্যব্রত গুণ

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
ডা. জয়ন্ত দাস

সহযোগী সম্পাদক
ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা. আশীষ কুমার কুন্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা. দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা. সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ নিত্য দাস, মনোজ দে

প্রচ্ছদ ❑ উৎপল বসু

বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক
ডা. জয়ন্ত কুমার দাস
স্বাস্থ্যের বৃত্ত-এর তরফে
ফ্ল্যাট : এফ-৩, ৫০/এ কলেজ রোড
হাওড়া-৭১১১০৩

মুদ্রক
এস এস প্রিন্ট, ৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়

স্বাস্থ্য ও উন্নয়নবিকার ৩

শরীর

এক বংশগত মারক রোগের টিকে থাকার ইতিবৃত্ত ❑ ডা. সুমিত্রন বসু ১১
গভীর রাতে বুকে ব্যথা হলে কী করণীয়? ❑ ডা. গৌতম মিস্ত্রী ১৫
বমি ❑ ডা. পার্থপ্রতিম পাল ১৯
শীত গ্রীষ্মে সান্দাকফু ❑ ডা. সূর্যেন্দু বিকাশ খাটুয়া ২২

মন

ভূতের ভর ৪০
স্কিজোফ্রেনিয়া ❑ ডা. সুমিত দাশ ৪৬

শরীর সমাজ

সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ওষুধ ❑ সম্পাদকমণ্ডলী ৫
কালের ভালোবাসা ❑ সায়মদেব মুখার্জি ২৭
বিস্থাপন ও মূলবাসীদের স্বাস্থ্য সমস্যা ❑ ডা. পুণ্যব্রত গুণ ৪৯
জাদুগোড়া—উন্নয়নের মূল্য চোকাবে কে? ❑ ঈপ্সিতা পাল ভৌমিক ৫৩

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

নবজাতকের খাদ্য খাবার : মায়ের খাবার ও বুকের দুধ ❑ ডা. স্বপন বিশ্বাস ৩১
'সারোগেসি' বা গর্ভদান ❑ ডা. কাঞ্চন মুখার্জি ৩৬
মেয়েদের মনের অসুখ ❑ রুমঝুম ভট্টাচার্য ৩৯

ক্যুইজ ❑ অভিষেক দাস ৬০

QUALITY is the way of life
PALSONS DRUGS
WHO-GMP
Certified Company
ISO 9001:2008
Certified Company
NABCB
QMS 009
IDMA
Quality Excellence
Award Winner
PALSONS DRUGS International Tie-ups
For Indian Market
Belgium
AURIGA
France
BIODERMA
Spain
Aesthetic Dermal
Spain
SKINTECH
PALSONS DRUGS PVT. LTD.
10/D/1, Ho-Chi-Minh Sarani
Kolkata - 700 071
Phone : 91-33-2282-3776/4277/4278
E-Mail : brandinfo@palsonsdrugs.com
www.palsonsdrugs.com
PALSONS DRUGS

সম্পাদকীয়

স্বাস্থ্য ও উন্নয়নবিকার

“... জীবনযাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ সুবিধে সব-কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে— উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।” রবীন্দ্রনাথ যখন এই কথাগুলো বলেছিলেন (রাশিয়ার চিঠি), দেশ স্বাধীন হতে তখনও সতেরো বছর বাকি। এখন, স্বাধীনতার পর সাতষট্টি বছর পেরিয়ে, তিনি বোধকরি অনেক আশা, অনেক আনন্দের সুরে বলতে পারতেন, ‘‘... এখানকার স্বাস্থ্যবিধির ব্যবস্থা ... তার প্রকৃষ্টতা দেখলে চমকে যেতে হয়।” (ঐ)

সত্যিই চমকে যেতে হয়। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড়ো রাষ্ট্রীয় উৎসব নির্বাচন দেশ জুড়ে সবে মাত্র পালিত হলো। মানুষের হাতেই এখন দেশ চালানোর প্রকৃত ক্ষমতা, বলছেন সমস্ত বড়ো বড়ো রাজনীতিবিদরা। আর সেই দেশের প্রথম ইউরেনিয়াম খনি, দেশের পরমাণু অস্ত্র ও বিদ্যুতের জোগানদার, ঝাড়খণ্ডের জাদুগোড়ায় প্রবল তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেখানকার মূলবাসীরা। তাঁদের মাটিতে, বাতাসে, জলে তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের পরিমাণ বেড়ে চলেছে, অথচ কর্তৃপক্ষ তথা সরকার নির্বিকার। কিন্তু মূলবাসীরা না জানলেও কর্তৃপক্ষ বিলক্ষণ জানেন, তেজস্ক্রিয়তার কণামাত্র অবশেষ ‘স্লো পয়জন’ হয়ে ঢুকে তিলে তিলে মেরে ফেলতে পারে, জন্ম দিতে পারে একের পর এক অসুস্থ প্রজন্মের। তেজস্ক্রিয়তার সঙ্গে আছে পরিবেশে ইউরেনিয়াম ও তা থেকে উৎপন্ন নানা মৌলঘটিত পদার্থের রাসায়নিক বিষক্রিয়া। ফল যা হওয়ার তাই হচ্ছে। সেখানে ক্যানসার বেশি, বিকলাঙ্গ শিশু জন্মানোর হার বেশি। পঙ্গু করে দেওয়া স্নায়বিক রোগ বেশি, বেশি ফুসফুসের রোগ। সেখানে নারীরা মৃতবৎসা বা বন্ধ্যা। জনগোষ্ঠীটাই শেষ হয়ে যাচ্ছে। মূলবাসী-অন্তেবাসী-আদিবাসীরা এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, কিন্তু বড়ো দেরি করে, বড়ো দুর্বলকণ্ঠে। আর তার উত্তরে আমাদের ভোপাল নিয়ে পরিবেশ দিবস পালন করা সরকার ইউরেনিয়াম খনিতেই চাকরির টোপ দিয়ে বিক্ষুব্ধদের বিচ্ছিন্ন করতে চাইছেন, বাইরে থেকে ঠিকা শ্রমিক দিয়ে কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন।

অবশ্য মানুষের জীবনের মূল্যে উন্নয়নের জয়যাত্রা নতুন কিছু নয়। ভোপাল গ্যাস কান্ডের ৩০ বছর হতে চলল, এখনও সেখানে মানুষে প্রজন্মের পর প্রজন্ম রাসায়নিক বিষের শিকার। আর জাদুগোড়ায় যাঁরা মারা পড়ছেন, তাঁরা তো আবার ‘আদিবাসী’, যাঁরা রাষ্ট্রের প্রায় প্রতিটা বড়ো ‘উন্নয়নে’ উচ্ছেদ হন, যাঁদের জীবনচর্চা নিয়ে উদ্বেল রোমান্টিকতার পাশাপাশি সে জীবন মুছে দেওয়ার আয়োজন চলে সবার চোখের সামনেই। বড়ো বাঁধ, বড়ো খনি, রাজপথ— সব তৈরি হয় তাঁদের চিরাচরিত অধিকারের বন-ভূমি-গৃহ থেকে তাঁদের উৎখাত করেই।

তাঁদের স্বাস্থ্য নিয়ে আর পাঁচজন তেমন জানেন না, তেমন ভাবিত নন। এবারের *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* আমাদের ভাবনাবৃত্তের বাইরে থাকা এই সব মানুষের স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন নিয়ে দু’চার কথা।

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত লেখা সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞান, বিশেষত চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে লেখা। এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার ভিত্তিতে কোনও পাঠক নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করার চেষ্টা করবেন না। সে চেষ্টা করলে ফলাফলের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবেই সংশ্লিষ্ট পাঠকের, পত্রিকার নয়।

ADVERTISEMENT

শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র

এক মডেল যা প্রমাণ করে
কম খরচে আধুনিক চিকিৎসা করা সম্ভবপর।

ক্লিনিক : চেঙ্গাইল-বেলতলা, উলুবেড়িয়া, হাওড়া

সাধারণ চিকিৎসা, শল্যচিকিৎসা, স্ত্রীরোগ, মনোরোগ, চর্মরোগ, দন্তরোগ,
চক্ষুরোগ, ফিজিকাল মেডিসিন, ফিজিওথেরাপি, ডায়াবেটিক ক্লিনিক,
শেখার অসুবিধা আছে এমন শিশুদের ক্লিনিক,
মানস-মন্দিত শিশুদের ক্লিনিক।

কম খরচে

প্যাথোলজি, এক্স-রে, ইসিজি, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, স্পাইরোমেট্রি।

সরকারি হাসপাতালের ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানের চেয়েও কম দামে ওষুধের দোকান।

যোগাযোগ : ০৩৩-৬৪৫৩১৮২১, ০৩৩-৩২২১৫৬২৮
ওয়েব সাইট : ww.shramajibiswasthya.org

প রি চা ল না য়
শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ

সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ওষুধ

'স্বাস্থ্য কোনও ভিক্ষা নয়, স্বাস্থ্য আমার অধিকার'— এ কথাটা পশ্চিমবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে শোনা গেছে অনেক বার। এই কথাটা জোর দিয়ে বলেছিলেন ১৯৮৩-এ পশ্চিমবঙ্গের জুনিয়র ডাক্তাররা। জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন সরকারি হাসপাতালে কিছু পরিবর্তন আনতে পারলেও তা ছিল ক্ষণস্থায়ী। দশক ঘুরতে না ঘুরতেই অবস্থা আগের চেয়েও খারাপ হল—সরকার পরিষেবা-ক্ষেত্র থেকে সরে আসতে শুরু করল। সে সব ছিল 'স্ট্রাকচারাল রি-অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রামে'র শর্ত। বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আই এম এফ (আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার)-এর ঋণ নিতে গিয়ে সরকার সেই শর্ত মেনে নেয়।

এখন কি চাকা উল্টোদিকে ঘুরছে? পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষণা করেছেন— সরকারি হাসপাতালে সব স্তরে বিনা মূল্যে জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক ওষুধ পাওয়া যাবে।

২০১৪-র জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন, সরকারি হাসপাতালের সব স্তরে সবাই বিনামূল্যে জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক ওষুধ ও কনজিউমেবল পাবেন। পাবেন রোগ-নির্ণয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিষেবাও, অবশ্য যে সব পরিষেবা প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপের অন্তর্গত, সেগুলো বিনামূল্যে পাওয়া যাবে না।

রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর এই মর্মে এক স্মারকলিপি প্রকাশ করেছে ৯ জানুয়ারি, স্মারকপত্রের ক্রমিক সংখ্যা— এইচএফ/ও/টিডিই/২৯/এম-০৮/১৩।

এই স্মারকলিপি থেকে জানা যাচ্ছে—

১. প্রাথমিক, দ্বিতীয় ও সর্বোচ্চ স্তরের জন্য অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকা তৈরি হয়েছে।
২. তৈরি হয়েছে প্রামাণ্য চিকিৎসা নির্দেশিকা (Standard Treatment Protocol)।
৩. নীতি নির্দেশ করা হয়েছে 'উত্তম প্রেসক্রাইবিং অভ্যাস'-এর (Good Prescribing Practice)।
৪. প্রেসক্রিপশন অডিটের নীতিনির্দেশ করা হয়েছে।
৫. স্থানীয় ওষুধের দোকান বা ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান থেকে কী ভাবে জরুরি ভিত্তিতে ওষুধ কেনা যাবে তার নির্দেশিকাও তৈরি হয়েছে।

নির্দেশিকার একটা কপি এখানে দিচ্ছি :

Government of West Bengal
Department of Health & Family Welfare
TDE Branch
Swasthya Bhawan,
GN-29, Sector – V
Salt Lake, Kolkata – 700091

No. HF/O/TDE/ 29 /M-08 /13 Dated, Kolkata 09.01.2013

Memorandum

Sub: Free supply of vital and essential drugs

Free supply of essential drugs to the patients in OPD/free beds in IPD/emergency of different state run Hospitals/health centres was under active consideration of the GoWB for some time past in order to reduce the burden of 'out-of-pocket expenditure' of the patients who visit Govt health facilities.

2. For this purpose, Drug budget for the department has been substantially increased duly supplemented by the fund allocation under JSSK. E-tender, E- procurement and E-payment system in respect of Drug and Consumables has been introduced and an web enabled 'Store Management information System' through a dedicated software has been developed and introduced in respect of health facilities upto the level of primary health care units to ensure greater transparency and accountability of indenting, purchase/procurement and bill payment of drugs, consumables and equipment, Quality control/assurance system of drug supply has been augmented & a vendor portal for the use of selected vendor has been created to access to the order, GRN and bill status on line.

3. In addition to that, the following guidelines/protocols were developed and published by the Deptt :
   a. An 'essential drug list' with application of drug in the primary, secondary and tertiary level.
   b. Standard Treatment Protocol.
   c. Guideline for 'Good Prescribing Practice'
   d. A guideline of 'Prescription Audit'
   e. A guideline regarding emergency local purchase through tie-up with local medicine shop/ Fair price medicine shop under JSSK

4. **Now after careful consideration, it is hereby ordered that vital and essential medicines (drugs & consumables) & all available diagnostic services in the concerned facility (excluding the diagnostic services under PPP) will be provided free of cost to all kinds of patients in OPD /all beds under IPD /emergency of different Hospitals /health centres run by the DHFW at the level of Primary level heath care facilities, as well as JSSK beneficiaries and RBSK beneficiaries.**

5. **It is also ordered that the vital and essential medicines (drugs and consumables) & all available diagnostics services (excluding the diagnostic services under PPP) will be provided free of cost to all kinds of patients in OPD/all free beds under IPD/emergency of different Govt Hospitals/health centres run by the DHFW at the level of Secondary and Tertiary level heath care facilities, as well as JSSK beneficiaries and RBSK beneficiaries.**

This will be supplemented by the JSSK fund under NHM where the vital and essential medicines (drugs and consumables) & all diagnostics services are being provided free of cost to all pregnant mothers and children upto one year in OPD/ beds under IPD/emergency of different Hospitals/health centres run by the DHFW to the primary, Secondary and Tertiary level heath care facilities.

Special Secretary

অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকা

এই স্মারকলিপি পড়ে আমরা অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকা ও অন্যান্য দলিলগুলোর খোঁজ শুরু করি। সরকারের তৈরি অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকা খুঁজতে গিয়ে স্বাস্থ্য ভবন থেকে আমরা যে তালিকা পেয়েছি, তা পূর্ববর্তী সরকারের আমলের, সরকারি আদেশ নং HF/O/TDE/55/5S-29/2010। ১৮ জানুয়ারি, ২০১১ তালিকাটা প্রকাশিত হয়। প্রামাণ্য চিকিৎসা নির্দেশিকা যেটা পাই সেটাও পূর্ববর্তী সরকারের সময়ের, কেবল প্রাথমিক স্তরের জন্য।

ওষুধের তালিকায় ওষুধগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে জীবনদায়ী (Vital),

অত্যাবশ্যক (Essential) ও বাঞ্ছনীয় (Desirable) হিসাবে। ধরে নেওয়া যায় স্বাস্থ্য দফতর এই তালিকারই জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক ওষুধগুলো আমাদের বিনামূল্যে দেবেন।

আমরা তালিকা থেকে জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক শ্রেণির ওষুধগুলোকে আলাদা করে সাজিয়ে দিয়েছি। আমাদের তো জানা দরকার— আমাদের সরকার কোন্ কোন্ ওষুধ বিনামূল্যে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

জীবনদায়ী ওষুধ (Vital)

এই ওষুধগুলো জরুরি ও জীবনরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। অল্প সময়ের জন্যও এই সব ওষুধের অভাব সহ্য করা যায় না। এই ওষুধগুলো একদিনও না থাকলে হাসপাতাল ঠিক মতো কাজ করতে পারে না বা হাসপাতালের কাজ গুরুতর ভাবে ব্যাহত হয়। এই ওষুধগুলো সব সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকা উচিত।

Pethidine HCl. Inj. 100 mg / 2 ml Amp.
Morphine Sulphate Inj. I. P. 10 mg/1 ml Ampoule
Adrenaline Inj. I.P. (1:1000) 1ml Amp.
Atropine Sulphate Inj. I.P. 0.6 mg/ Amp.
Pralidoxime Inj. 500 mg / 20 ml Vial.
Diazepam Inj.I.P. 10 mg/2ml Ampoule
Phenytoin Sodium Inj.I.P.100 mg.in 2ml Ampoule.
Magnesium Sulphate Inj. B.P. 10% w/v Amp.
Quinine Dihydrochloride Inj. 300 mg / ml. in 2 ml
Artemether Injection 80 mg/ml Amp..
Combipack SP-ACT. Pyrimethamine 25mg.+Sulphadoxine 500mg. Tab. I.P.
Calcium Gluconate Inj. I.P.10% w/v in 10ml/Amp.
Dopamine HCl Inj.B.P 200mg/5ml Amp.
Dopamine HCl Inj. B.P 250 mg / 20 ml Vial
Frusemide Inj. I.P 20mg/2ml. Ampoule
Mannitol Inj. I.P 20% Solution
Ranitidine Inj.I.P. 50mg/2ml. Ampoule
Metoclopramide Inj. I.P. 10mg./2ml. Ampoule
Dexamethasone Sodium Phosphate Inj. I.P.8mg./2ml. Vial
Hydrocortisone Sodium Succinate Inj. I.P. 100 mg/Vial
Hydrocortisone Hemisuccinate Inj. 100mg./Vial
Soluble Insuline Inj. I.P. 40 I.U. / ml in 10 ml Vial (cold chain).
Purified chick embroyo (PCEC) vaccine.
Anti-Venom Serum (Polyvalent) 10ml. Ampoule
Anti Tetanus (Human) Immunoglobulin inj. 500 i.u./ Vial.
Tetanus Toxoid Inj. 0.5ml./ ml Dose (absorbed)
Anti Rabies Serum I.P. 1500 I.U./5 ml in 5ml Vial
Neostigmine Methylsulphate Inj.I.P. 0.5mg/ 1 ml Ampoule
Succinylcholine Chloride Inj. 50mg./ml.
Synthetic Oxytocin Inj.I.P. 5 units/ 1ml. Ampoule
Magnesium Sulphate Inj. U.S.P. 10% in 2ml amp.
Magnesium Sulphate Inj.U.S.P. 50% in 2ml amp.
Misoprostol Tab.200 mcg
Misoprostol Tab. 100 mcg
Salbutamol Nebuliser Solution B.P. 0.5 mg/ ml
Oral Rehydration Salt I.P. '96 as Powder for Reconstitution containing : Sod. Chloride-2.6 gms, Dextrose (anhydrous - 13.5 gms) Pot. Chloride-1.5 gms & Sod. Citrate-2.9 gms (Total -20.5 gms per packet.)
Oral Rehydration Salt I.P. '96 as Powder for Reconstitution containing : Sod. Chloride-2.6 gms, Dextrose monohydrade 14.85gms, Pot. Chloride- 1.5 gms & Sod. Citrate-2.9 gms (Total -21.85gms per packet.)
Sodium Chloride Injection 0.9% (Normal or Isotonic Saline) Na.+154 mmol/L.,Cl.- 154 mmol/L
Sodium chloride Inj. 0.9% (Noormal or Isotonic Saline) Na.+ 154mmol/L.,Cl.- 154mmol/L
Sodium Chloride & Dextrose Injection I.P.
Sodium Chloride & Dextrose Injection I.P.
Ringers Lactate Solution for Inj. I.P.
Dextrose Inj.I.P. 5% w/v bottle (280 mosm/L) Isotonic
Dextrose Inj.I.P. 25% Amp. of 25 ml.
Sodium Bicarbonate Inj.I.P. 7.5% w/v in 10ml./Amp.
Water for Injection I.P. 5ml. Amp.
Vit. - K Inj. 1 mg / 0.5 ml Vial.

অত্যাবশ্যক (Essential)

জরুরি ও জীবনরক্ষার পরিস্থিতি ছাড়া অন্য পরিস্থিতিতে এই ওষুধগুলো ব্যবহার করা হয়। অল্প সময়ের জন্য এগুলোর অভাব সহ্য করা যায়, বেশি সময়ের জন্য না থাকলে রোগীর যত্ন ও হাসপাতালের কাজ ব্যাহত হয়।

অত্যাবশ্যক-এ (Essential-A)

এই অত্যাবশ্যক ওষুধগুলো প্রধানত সাধারণ তীব্র (acute) অবস্থার আউটডোর ও ভর্তি রোগীদের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি বলে ধরা যেতে পারে।

Lignocaine 2% and Adrenaline (1 in 100000) Inj.
Lignocaine HCl Inj. IP 0.2% w/v
Lignocaine HCl Gel I.P 2%
Acetylsalicylic acid I.P. 300 mg Tablet
Paracetamol I.P. 500 mg. Tab.
Paracetamol I.P. 125 mg. Tab.
Tramadol HCl. Inj. 100mg/ 2ml Amps.
Pentazocine HCl. Inj.I.P. 30 mg/ 1ml Amps.
Diclofenac Sodium Injection I.P. 75mg/ 3ml Amps.
Chlopheniramine Maleate I.P. 4mg Tab.
Diazepam I.P. 5mg Tab.
Metronidazole Tab. I.P. 400 mg (Film coated)
Metronidazole Inj. I.P. 5 mg / ml.
Sulphamethoxazole 800mg + Trimethoprim 160 mg I.P.
Amoxycillin Trihydrate Caps. I.P 250mg
Amoxycillin Trihydrate Dispersible Tabs. I.P 125 mg
Ampicillin Sodium Inj.I.P 500mg / Vial.

Ciprofloxacin HCl Tab. I.P. 500mg (scored)
Gentamycin Sulphate Inj.I.P. 80mg/2ml Vial
Norfloxacin Tab. I.P. 400mg
Amikacin Inj. I.P. 100 mg/2ml.Vial
Azithromycin Tab. I.P.250 mg
Zinc Sulphate 200mg. (Dispersable)
Clotrimazole Vaginal Tab.U.S.P.
Heparin Sodium Inj.I.P. 5000 I.U./ml.
Protamine Sulphate Inj. I.P.10 mg/ml. in 5ml. Ampoule
Hydroxy Ethyl Cellulose B.P. (6%) w/v in 500 ml.
Tranxamic Acid Inj. 500 mg/ 5ml Amp.
Atenolol Tablet I.P. 50mg (scored) .
Nitroglycerin Tablet I.P. 0.5mg
Streptokinase Inj. I.P.1500000 I.U. / 1 ml Vial
Streptokinase Inj. I.P. 750000 I.U. / 1 ml Vial
Adenosine Inj. U.S.P. 3 mg / ml in 2 ml Vial.
Framycetin Sulphate Oint. (1%)
Gamma Benzene Hexachloride I.P.
Combined Gastric Antacid Tab. (Alum. + Mag.Hydroxide)
(Total salt being not less than 500mg)
Famotidine Tab. B.P. 20mg
Oxyphenonium Bromide Tab.5mg.
Dicylomine Hydrochloride Inj 10 mg/ ml in 2 ml vial
Prednisolone Tab.I.P. 5mg
Prednisolone Tab.I.P. 10mg
Prednisolone Tab.20mg.
Diphtheria Antitoxin Inj.I.P. 10,000 I.U./Vial.
Neostigmine Methylsulphate Inj.I.P. 2.5mg/ml Ampoule
Atracurium besylate Inj.U.S.P. 25 mg/ 2.5 ml Amp.
Dexamethasone Eye Drop 0.1%
Ciprofloxacin Eye Drop. 0.3%
Tropicamide Eye Drop I.P. 1%
Ergometrine Maleate Inj.B.P. 0.2mg/ml. in Ampoule
Ergometrine Maleate Tab.B.P. 0.2mg.
Carboprost Tromethamine Inj.U.S.P. 250mcg./ml.
Lorazepam Inj. B.P. 4 mg/ 2 ml Amp
Theophyline 50.6mg with Etophyline 169.4mg Inj./2ml Amp.
Ipratropium Nebuliser Soln 0.5 mg/ ml
Sodium Chloride Inj. 0.9%/100ml.
Dextrose Inj. 10% (650 mosm/L) Hypertonic
Paediatric Maintenance Electrolyte Solution
Glutaraldehyde Solution 2% for instrument sterilization
Cresol with Soap Solution 50% I.P.
Povidone Iodine Solution I.P 5% w/v
Ethanol I.P. 95% (Rectified Spirit)
Developer (X-Ray film)
Fixer (X-Ray film)
Lishmen Stain 25 mg.
Hydrogen Peroxide I.P. 500 ml.
Ciderwood Oil 25 gms.
E.D.T.A. Powder

অত্যাবশ্যক-বি (Essential-B) :

এই অত্যাবশ্যক ওষুধগুলো প্রধানত সাধারণ দীর্ঘস্থায়ী অবস্থাগুলোর আউটডোর ও ভর্তি রোগীদের চিকিৎসার জন্য। এইগুলোর প্রয়োজন মাঝারি।

Lignocaine Solution Sterile B.P4% (for topical use)
Paracetamol Susp.B.P. 125 mg/5ml.
Ibuprofen I.P. 200 mg Tab.
Promethazine HCl I.P. 10 mg Tab
Promethazine HCl Inj. I.P. 50 mg/2ml Ampoule
Promethazine Oral Soln. I.P. 5 mg / 5 ml
Diazepam Oral Solution B.P. 2 mg/5ml
Phenobarbitone Sodium I.P.30 mg Tab.
Phenytoin Sodium I.P. 100 mg Tab.
Phenytoin Oral Suspension B.P.25 mg/ml
Sodium Valproate 200 mg Tab.
Sodium Valproate Oral Solution I.P. 200 mg/ 5ml.
Carbamazepine I.P. 200 mg Tab.
Carbamazepine 100 mg/ 5ml Syrup.
Metronidazole Benzoate Oral Suspension I.P.100 mg / 5 ml
Acyclovir Tab. I.P. 200 mg
Albendazole Oral Suspension U.S.P. 400mg/10ml
Albendazole Tab. I.P. 400 mg.
Benzathine Penicillin Injection I.P 12 lacs unit/Vial.
Benzathine Penicillin Injection I.P 6 lacs unit /vial
Sulphamethoxazole 100mg + Trimethoprim 20mg tab IP
Amoxycillin Oral Susp.B.P125 mg./ 5 ml
Ciprofloxacin Inj. I.P. 2mg/ml
Norfloxacin Tab. I.P. 100mg.(Dispersable)
Amoxycillin 1 g with Clavulinic Acid 200 mg injection
Amoxycillin 500mg + Clavulanic Acid 125mg Tab
Nystatin Tablet 5,00,000 I.U.
Fluconazole Tablet U.S.P 100mg
Fluconazole Tablet U.S.P 200mg
Clotrimazole Mouth Paint.
Cotrimazole Tab. 1 mg.I.P.
Levedopa 100mg + Carbidopa 10mg Tab. I.P.
Trihexyphenidyl HCl Tablet I.P 2 mg
Bromocriptine MesylateTab. I.P 2.5 mg
Verapamil HCl Tablet I.P. 40mg
Amlodepine Tablet I.P. 5mg
Methyldopa Tablet I.P. 250 mg
Digoxin Tablet I.P. 0.25 mg
Digoxin Inj. I.P. 0.5mg / 2 ml Amp.
Digoxin Paediatric Soln.I.P. 0.05mg/ ml.
Enalapril Maleate Tablet I.P. 5mg.(scored)
Isolyte-M Inj.
Silver Sulphadiazine Cream 1 %

Antibiotic Ointment: Each Gm. contains:Polymycine B-Sulphate- 5000 I.U., Neomycin Sulphate- 3400 I.U., Zinc Bacitracin - 400 I.U.
Betamethasone Oint.I.P. 0.1% (as Valerate)
Frusemide Tab. I.P 40mg
Domperidone Tab.I.P. 10 mg
Dicylomine Hydrochloride 10 mg Tab.
Bisacodyl Tab.I.P. 5mg.
Glybenclamide Tab.I.P. 5mg
Acyclovir Eye Oint. 3%
Nifedipine Caps. 10 mg
Salbutamol Tab.I.P. 4mg (scored)
Vitamin B.Complex Tab.NFI- III (Prophylactic) Each Tab Contains:- Vit. B1- 2mg,Vit. B2-2mg,Vit. B6- 0.5mg, Niacinamide- 25 mg, CalciumPantothenate 1mg.
Vit. - K Inj. 10 mg / ml in 1 ml Amp.
Antiseptic Lotion 5-15% Cetrimide + 8% Chlorhexidine Combination
Bleaching Powder (containing 33% of available chlorine)
Phenyle (RW coeff 5-7)
Gention Violet U.S.P. 25gm.
Compound Benzoin Tincture I.P.
Potassium Permanganate Crystals I.P.
Formalin (40% solution)
Formaldehyde Tablet
Antiseptic Lotion containing Chlorhexidine Solution I.P. 5%
Puriffied Water I.P.
Pyrogen free triple distilled water I.P.for intraoperative use after sterilization.
Absolute Alcohol I.P.

অত্যাবশ্যক-সি (Essential-C)

এই অত্যাবশ্যক ওষুধগুলো হয় জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচীগুলো দ্বারা সরবরাহ হয় বা এগুলো অত্যাবশ্যক-এ ও বি-র সাসপেনশন রূপ। সাধারণভাবে এদের প্রয়োজনীয়তা তুলনায় কম।

Diclofenac Sod. 50 mg Tab.
Diethylcarbamazine Citrate I.P. Tab.50 mg
Sodium Antimony Gluconate Inj.I.P.100 mg of Pentavalent antimony/ml in 30 ml Vial
Miltefosine 50mg Tab
Chloroquine Phosphate Tab. I.P.
Chloroquine Susp.I.P. 50 mg Base/5 ml.
Chloroquine Phosphate Inj. I.P. 200 mg / 5 ml Ampoule
Quinine Sulphate Tab. I.P. 300 mg
Primaquine Tab. I.P. 2.5 mg.
Primaquine Tab.I.P. 7.5 mg.
Sulphadoxin 500mg & Pyrimethamine 25 mg Tab.
Artesunate Injection 60 mg./ml Vial
Clofazimine Capsule 50mg
Clofazimine Capsule I.P. 100 mg
Dapsone (Diaminodiphenyl Sulphone) Tab. I.P. 50 mg
Dapsone (Diaminodiphenyl Sulphone) Tab. I.P. 100 mg
Rifampicin Capsule.I.P. 600 mg
Sulphamethoxazole 200mg + Trimethoprim 40mg Susp. I.P in 5ml
Sulphamethoxazole 400mg + Trimethoprim 80mg Tablet IP
Doxycyclin Hyclate Tab.U.S.P. 100mg
Azithromycin Tab.I.P. 500 mg
Streptomycin Sulphate Inj.I.P. 0.75 gm / Vial
Rifampicin Capsule/Tablet I.P.300mg
Rifampicin Capsule/Tablet I.P.450mg
Rifampicin Capsule I.P. 150 mg.
Isoniazide Tab.I.P. 300mg
Isoniazide Tab.I.P. 100mg (in Almn. Strip)
Ethambutol HCl Tabs. I.P. 400mg
Pyrazinamide Tab.I.P. 500mg
Thiacetazone Tabs 150 mg
INH 300mg + Thiacetazone 150mg Tablet I.P.
INH 300mg + Rifampicin 450mg Tablet I.P.
Ferrous Fumarate 200mg + Folic Acid 0.5 mg Tablet B.P.
Desferrioxamine Inj. 500mg/Vial
Gention Violet 0.5% Solution
Permethrin Cream 5%
Comb. Gastric Antacid Susp.(Al.+ Mg. Hydroxide) (Total Salt being not less than 500mg/5ml.)
Dicyclomine Drops 10mg./ml.
Ethinyl Oestradiol + Levonorgestryl 50mcg +250mcg Tab.
Metformin Tab.I.P. 500 mg
Hepatitis B Vaccine (multi dose 10 ml vial)100 mcg
Hepatitis B Vaccine (DNA) I.P. 20mcg./ml. in 10ml.Vial
Tetanus Antioxin I.P. 1000 I.U./ml in Vial
Poliomyelitis Vaccine I.P. (Live Attenuated) Oral solution
Measels Vaccine Inj.I.P. (Live Attenuated)
Diptheria & Tetanus Vaccine I.P. (absorbed)
Diptheria, Tetanus & Pertusis Vaccine I.P.(absorbed)
B.C.G.Vaccine Inj.B.P. (Dried)
Atropine sulphate eye Ointment. I.P. 1%,
Homatropine Hydrobromide Eye Drop I.P. 2% w/v
Fluorescene sodium Opthalmic Strip U.S.P.
Salbutamol Syrup I.P. 2mg./5ml.
Vitamin A Concentrate I.P. 1,00,000 I.U./ml. Ampoule (Oily form)
Halazone Tablet for Solution U.S.P. 4mg
Temphos 50% EC.(I.S.I. Specification.)
Pyrethrum extract 2% Bti (AS/ WP) I.S.I. Specification.

বাঞ্ছনীয় (Desirable)

এই ওষুধগুলো হয় জীবনদায়ী / অত্যাবশ্যক ওষুধগুলোর উচ্চতর প্রজন্মের

অণু অথবা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা ব্যবহার্য ওষুধ। যদি লম্বা সময় ধরে এই ওষুধগুলো পাওয়া নাও যায় তা হলেও রোগীর চিকিৎসা বা হাসপাতালের কাজকর্ম ব্যাহত হয় না। তালিকায় এই শ্রেণির ৪০৬টা ওষুধ রয়েছে। কিন্তু সরকার এই ওষুধগুলোকে বিনামূল্যে দেবেন না, তাই এই সব ওষুধের নাম লিখে তালিকা দীর্ঘ করছি না।

কোন ওষুধ কতগুলো?

- জীবনদায়ী : ৪৮
- অত্যাবশ্যক-এ : ৬৭
- অত্যাবশ্যক-বি : ৬৮
- অত্যাবশ্যক-সি : ৫৬
- বাঞ্ছনীয় : ৪০৬

বিশেষ জায়গার জন্য বিশেষ ওষুধ

যেখানে রোগীদের অজ্ঞান করা হয় :

৬টা ওষুধ অত্যাবশ্যক-এ শ্রেণির—

Thiopentone Sodium Inj. IP 0.5gm Ampoule/Vial with diluent
Halothane Inhalation
Katamine HCI Inj. IP 50 mg/ml in 10 ml Vial
Lignocaine HCI Inj. IP. 5% W/V in 2ml Amp. (heavy) for Spinal Anaesthesia
Bupivacaine Inj. BP 0.5% (heavy) 4ml Ampoules
Bupivacaine Inj. IP 5mg/ml in 20 ml Vial

যেখানে মনোরোগ চিকিৎসা করা হয় :

৭টা ওষুধ অত্যাবশ্যক-বি শ্রেণির—

Fluoxetine Tab 20 mg
Haloperidol Tab. I.P. 5mg
Sertraline Tab. 50 mg
Risperidone Tab. 3 mg
Clomipramine Tab. 25 mg
Olanzepine Tab.I.P. 5mg
Devalporate Sodium Tab. 500 mg

যেখানে এসএনসিইউ / এসইউ আছে :

৬টা ওষুধ জীবনদায়ী—

Cloxacillin Sodium Inj. I.P. 250mg/5ml Vial
Cefotaxime Sodium Inj. I.P. 500 mg/2ml Vial
Ceftriaxone Inj. B.P. 250mgVial.
Heparin Sodium Inj. I.P. 5000 I.U./ml.
Aminophyline Inj. I.P. 250 mg/10 ml Amp.
Dextrose Inj. 10% (650 mosml/L) Hypertonic

যেখানে নবজাতকের চিকিৎসা হয় :

১০টা ওষুধ জীবনদায়ী —

Phenobarbitone sodium Inj 200 mg in 1 ml
Naloxone Inj 400mg in 1 ml
Gentamycin Inj 20 mg in 2ml
Dextrose Inj. 25% in 100 ml
Potassium Chloride Inj. 10 ml
Sodium Chloride Inj. 0.9% in 100 ml
Sodium Chloride Inj. 0.9% in 25 ml
Sodium Chloride Inj. 0.45% in 500 ml
Inj. Sodium 25 MEQ/L, Potassium 20 MEQ/L, Dextrose 5% in 500 ml
Inj. Sodium 25 MEQ/L, Potassium 20 MEQ/L, Dextrose 10% in 500 ml

আরেকটা অধিকার সম্পর্কে সচেতন হোন।

৩রা মার্চ, ২০১৪ তারিখে এক আদেশ (নং এইচ / টিডিই / ২৪১/ ৫এস-০৮/১৪)-এ স্বাস্থ্য দফতর সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ওষুধের পুরো কোর্স দিতে নির্দেশ দিয়েছে।

এতদিন রীতি অনুযায়ী, আউটডোর বা ইমার্জেন্সি থেকে ৩ দিনের ওষুধ রোগীকে দেওয়া হত, ডাক্তার রোগীকে যত দিন বাদেই দেখাতে আসতে

Government of West Bengal
Health & Family Welfare Department
TDE branch
Swasthya Bhavan,
GN 29, Sector V,
Salt Lake, Kolkata 700 091

No H/TDE/ 241 /SS-08/14 Dated, Kolkata 03.03.2014

ORDER

The drug procurement and distribution arrangement has been thoroughly revamped in West Bengal w.e.f June, 2011 with main objective to enhance the availability of essential and vital drugs free of cost to the poor patients in govt hospitals to minimize their out of pocket expenses. The reforms were also aimed at providing value for money, increasing transparency in procurement and enhancing accountability at all tiers.

With the increase in drug and consumables budget over the years, the procurement of drug, equipment and consumables has been streamlined through an web enabled dedicated software which enable the concerned facility to know the order status, delivery status, current stock position, pipeline stock, bill payment status and fund utilization. Procurement has better streamlined on the basis of actual projected requirement. Distribution is being done on First expiry First Out (FEFO) basis, short expiry dates are being not allowed, the entire payment process has been regularized, vendors have access to the system. Physical verification of stock has been found easier.

In the meantime, Free drug policy of the State has been announced and circulated by this office no HF/O/TDE/ 29 /M-08 /13 Dated 09.01.2014.

At present, as per the existing dispensing protocol, the patient attending the OPD/Emergency are provided with drugs for only 3(three) days duration. As a result of which, the concerned patients are to attend OPD after 3(three) days to collect drugs for the remaining courses of treatment resulting in incurring unnecessary out-of-pocket expenditure. Many patients under chronic cases like hypertension, mental disorder and other ailments are supplied medicine and antibiotics for 3(three) days resulting in chances of drug resistant.

Under this backdrop, it is felt necessary to revise the dispensing protocol.

Now, after careful consideration of the mater, the Governor is pleased to direct that the Govt health facilities/units will provide full course of medicine to the patients as per prescription provided by the attending physician in the OPD at the time of/during the first visit at Govt hospital & also at emergency department. The next visit date of the patient in the OPD should only be considered by the attending physician for clinical purpose only. Medicine should be provided to the OPD patients in the subsequent visits as per prescription.

The order will immediate effect and would continue until further order.
This has approval of the Principal Secretary of this Department.

Special Secretary

বলুন না কেন। ফলে ৩ দিন পর রোগীকে আবার ওষুধ নিতে আসতে হত। নতুন আদেশ অনুযায়ী, ডাক্তার রোগীকে যত দিন বাদে আসতে বলবেন তত দিনের ওষুধ দেওয়া হবে।

আমাদের কথা

সরকার সবার জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরিষেবা দিক— এই দাবি অনেক দিনের। চিকিৎসা-পরিষেবার একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রেখেছে ওষুধ, চিকিৎসার মোট খরচের একটা বড় অংশ (৭০ থেকে ৮০%) জুড়ে থাকে ওষুধের দাম। রাজ্য সরকার সমস্ত মানুষকে বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ওষুধ দিলে অবশ্যই আমাদের ধন্যবাদার্হ হবেন।

তবে এর সঙ্গে সঙ্গে সব স্তরের জন্য প্রামাণ্য চিকিৎসা নির্দেশিকা কার্যকর করা দরকার, না হলে বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ওষুধ পাওয়া গেলেও রোগীর জন্য হয়তো লেখা হবে অত্যাবশ্যক নয়—এমন ওষুধ।

আর একটা বিষয়ও বলার— সরকার কোনও আদেশ দিলেই অধিকার অর্জিত হয় না, অধিকার অর্জনে সচেতন হতে হয় নিজেদেরও— সরকারি আদেশ যাতে স্বাস্থ্য দফতরের ওয়েবসাইটে আবদ্ধ না থেকে কার্যকরী হয়।

এত ওষুধের নাম দিয়ে নিবন্ধটা আকারে কিছু বড় হয়ে গেল। কিন্তু সেটা ছাড়া উপায় নেই। কেননা বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য হল, পাঠকদের জানানো যে এতগুলো ওষুধ সরকার সরকারি হাসপাতালগুলোতে বিনামূল্যে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং সেই মর্মে নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন। আপনার এলাকায় সরকারি হাসপাতালে এই সব ওষুধ না থাকলে উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে জানান ও আপনার অধিকার সুনিশ্চিত করার যাবতীয় প্রচেষ্টা নিন।

এই প্রতিবেদন *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকার সম্পাদকীয় টিম কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত।

ADVERTISEMENT

KLOSTER Pharmaceuticals

B/13/H/3, Braunfeld Road, Kolkata-700 027,
Phone : 033 2449-0144, Mob.: 98306 63724
E-mail : kloster_pharma@yahoo.co.in
Website : klosterpharma.com

জিন-এর 'সম্ভাবনা' এবং অ-'সম্ভাবনা' : আজকের সময়ের একটা পুনর্মূল্যায়ন

পর্ব এক

এক বংশগত মারক রোগের টিকে থাকার ইতিবৃত্ত

জিন। ডাক্তারবাবু যখন গম্ভীর মুখে বলেন, বংশগত রোগ, জেনেটিক রোগ, আমরা হাল ছেড়েই দিই। এ রোগ ভাল হবে না তো পুরোপুরি। আর মনে হয়, এ বোধকরি আমাদের পূর্বজন্মের পাপ, এ এক অভিশাপ। কিন্তু জেনেটিক রোগ কি কেবল অভিশাপ? না কি একটু বড় প্রেক্ষাপটে দেখলে এ হল মানবজাতির জন্মের জঠর-যন্ত্রণা? এ যন্ত্রণা ছাড়া তো জন্ম হয় না! জিন নিয়ে, জাতি নিয়ে, মানুষের জন্মগত গুণ ও দোষ নিয়ে, যে সব গল্পকথা অতিকথা তৈরি হয়েছে সেগুলো বিজ্ঞান না কি রাজনীতি? জিনগত রোগের হাত ধরে সেই সব মৌলিক প্রশ্নের দরজায় পৌঁছে দিচ্ছেন **ডা. সুমিত্রন বসু।**

ছেলেটির বয়স বছর ছয়েক; অপুষ্ট এবং অ্যানিমিক, পা আর পেটে প্রচণ্ড ব্যথায় ভীষণ ছটফট করছে। পেটের পিলেটা বিরাট বড় আর ভীষণ ব্যথা। ওর একটা রক্তের রোগ আছে, 'সিকল সেল অ্যানিমিয়া'। আপাতত সেই রোগটা নিয়েই দু'চার কথা বলি।

রক্তের একটা প্রধান কাজ অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিবহণ করা— সেই কাজটা করে হিমোগ্লোবিন। হিমোগ্লোবিনের নাম আপনাদের শোনা আছে বোধ হয়। সেটা হল একটা প্রোটিন আর লোহা (আয়রন)—এ দুয়ের যৌগ। এই যৌগ থাকে রক্তের লোহিত রক্তকণিকাগুলোর মধ্যে। ছেলেটির যে রোগ হয়েছে, সে রোগে হিমোগ্লোবিনের প্রোটিন অংশটা বিগড়ে গিয়ে লোহিত রক্তকণিকার ভেতরে লম্বা 'চেন' তৈরি করে। কিন্তু লোহিত রক্তকণিকার চেহারাটা ছোট্ট, চ্যাপ্টা চাকতির মতো। বিগড়ে যাওয়া হিমোগ্লোবিন-এর লম্বা চেন সেখানে থাকার জায়গাই নেই। ফলে প্রথমে লোহিত রক্তকণিকাগুলো বাঁকা ও লম্বাটে হয়ে গিয়ে অনেকটা কাস্তের আকার নেয়, তারপর ভেঙে যায়। লোহিত রক্তকণিকা যে হারে ভেঙে যায় সেই হারে নতুন কণিকা তৈরি হয় না। ফলে রক্তে লোহিত রক্তকণিকার মোট সংখ্যা কমে; ডাক্তারবাবু বলেন, অ্যানিমিয়া হয়েছে। আবার লোহিত কণিকাদের কাস্তে-মার্কা চেহারাটা এমন শক্ত হয়ে যায় যে তারা ছোট ছোট রক্তনালীর মধ্যে গিয়ে সেগুলোর ছিদ্রকেই দেয় আটকে। রক্তনালী কোষে কোষে অক্সিজেন যোগায়, সেটা আটকে গেলে একটা অঞ্চলে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়, সেখানকার কোষগুলো মারা যায়; সে সময় প্রবল ব্যথা হয়, আর পরে জায়গাটায় ঘা হয়ে যায়। চিকিৎসা ছাড়া এই রোগীরা বেশিদিন বাঁচেন না।

আমাদের দেশে এই বংশগত ব্যাধিটা খুব বিরল নয়। আফ্রিকায় এই রোগের প্রকোপ অনেক বেশি। নাইজিরিয়ায় শতকরা ২ জন শিশু এই রোগ নিয়ে জন্মায়। বস্তুতপক্ষে, এই রোগটা কিন্তু আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। কী করে এমন একটা মারক রোগ এতদিন ধরে বংশাণুক্রমে মনুষ্য প্রজাতির মধ্যে টিকে থাকতে পারল সেইটা এক অবাক কাণ্ড, আর তাই নিয়েই আজকে আমাদের যুক্তি তক্কো আর গল্প। জিনের গল্প।

'অটোসোমাল অপ্রকট' ব্যধি

সিকল সেল অ্যানিমিয়া বংশগত রোগ। বংশগত, কিন্তু বাবা বা মা'র কোনও একজনের কাছ থেকে বাচ্চার রোগ হতে পারে না। বাবা ও মা দু'জনেরই এই রোগের জিন থাকলে বাচ্চাদের মধ্যে এই রোগ হতে পারে। আর একটু খুঁটিয়ে বললে, বাবা-মা দু'জনেরই রোগের জিন থাকলে গড়পড়তায় চারজন ছেলেমেয়ের একজনের এই রোগ হয়। একে বলে 'অটোসোমাল অপ্রকট' রোগ। এখন এই কথাগুলো একটু বুঝে নেব, অবশ্য তাতে বেশি সময় লাগবে না।

মানুষের এবং সমস্ত প্রাণীর শরীর অজস্র কোষ দিয়ে গঠিত, আর সে সব কোষের প্রায় প্রত্যেকটার ভেতরে 'নিউক্লিয়াস' (Nucleus) রয়েছে। তার ভেতরে থাকে একাধিক 'ক্রোমোসোম' (Chromosome) -এর জোড়া। যে কোনও মানুষের সমস্ত ক্রোমোসামের প্রতিটা জোড়ার মধ্যে একটা মা'র কাছ থেকে এবং আর একটা বাবার কাছ থেকে পাওয়া। প্রতিটা প্রাণীর, বা বিজ্ঞানের ভাষায় বললে, প্রতিটা প্রজাতির প্রতিটা সদস্যের এই ক্রোমোসোম জোড়ার সংখ্যা একেবারে নির্দিষ্ট, আর সাধারণ ভাবে এই সংখ্যার কোনও নড়চড় ঘটে না— যেমন মানুষের রয়েছে ২৩ জোড়া, আর গরুর ৩০ জোড়া ক্রোমোসোম। মানুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোসোমের মধ্যে ২২ জোড়ার প্রত্যেকটাতে জুড়ির দুটো ক্রোমোসাম এক রকমের এবং একটা জুড়ির দু'টো ক্রোমোসোমের মধ্যে কোনটা মা'র কাছ থেকে আর কোনটা বাবার কাছ থেকে, সেটা বলা ভারী শক্ত। কিন্তু ছেলেদের ২৩ নম্বর ক্রোমোসোম-জোড়ায় জুড়ি-ক্রোমোসোমের দুটো দু'রকম; একটা বড়সড়, সেটাকে বলে এক্স-ক্রোমোসোম। অন্যটা ছোটখাট, সেটার নাম ওয়াই-ক্রোমোসোম। ইংরেজিতে লিখলে, X আর Y। মেয়েদের কিন্তু দুটো ক্রোমোসোমই বড়সড়, অর্থাৎ দুটোই এক্স (X) ক্রোমোসোম। তার মানে, গোঁফ দিয়ে চেনার দরকার নেই, মানবদেহের যে কোনও নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ নিয়ে তার থেকে ক্রোমোসোম রঙ করে অণুবীক্ষণে দেখে বলে দেওয়া যায় ছেলে না মেয়ে।

পাঠক নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে গেছেন, ছেলেরা তাদের একটা মাত্র এক্স-ক্রোমোসোম পায় মা'র কাছ থেকে আর ওয়াই-ক্রোমোসোমটি পায় বাবার কাছ থেকে আর মেয়েরা তাদের দুটো এক্স-ক্রোমোসোমের একটা পায় বাবার কাছ থেকে আর অন্যটা মায়ের কাছ থেকে। অবশ্য আমাদের গল্পে X আর Y এই দুটো 'সেক্স-ক্রোমোসোম'-এর তেমন দরকার নেই, ওদের কথা বলা কেবল ওদের আলাদা করে রাখব বলে। এই দুটো 'সেক্স-ক্রোমোসোম' বাদে বাকি ২২ জোড়া ক্রোমোসোমের প্রতিটাই এক-একটা অটোসোম। এই অটোসোমগুলোর মধ্যে একটা, বিজ্ঞানীরা যেটাকে ১১ নম্বর ক্রোমোসোম বলে চিহ্নিত করেছেন, সেইটাতে সিকল সেল অ্যানিমিয়ার জিন থাকে, তাই এ-রোগটা 'অটোসোমাল'।

কথাটা কিন্তু ভুল বললাম, কেননা ওখানে আসলে সিকল সেল অ্যানিমিয়ার জিন থাকে না, থাকে হিমোগ্লোবিনের প্রোটিন অণুর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ, বিটা গ্লোবিন-এর সংকেত বহনকারী জিন। সেই জিনটা আর পাঁচটা জিন-এর মতোই একটা লম্বা বৃহৎ জৈব-অণু, ডিএনএ (DNA)-অণু। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ক্রোমোসোমের একটা বড় অংশই ডিএনএ অণু, আর ক্রোমোসোমের বাকি যা অংশ আছে সেটার কাজ হল বিরাট লম্বা এই ডিএনএ অণুকে গুছিয়ে রাখতে সাহায্য করা। স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনের সংকেত বহন করে একটা ডিএনএ-নির্মিত জিন।[১] সেই জিনটার একটামাত্র জায়গায় একটা ছোট স্বাভাবিক অংশের বদলে ভুল অন্য একটা অংশ থাকার ফলে একটু ভুল 'বিটা গ্লোবিন' প্রোটিন নির্মিত হয়। এই 'বিটা গ্লোবিন' প্রোটিন হল হিমোগ্লোবিনের অংশ, সেটা ভুলভাবে তৈরি হলে হিমোগ্লোবিন-এর চেহারাও স্বাভাবিক থাকে না। সেই অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন সহজেই বিগড়ে গিয়ে লম্বা 'চেন' তৈরি করে লোহিত রক্তকণিকার ভেতরে, সেটাই হল 'সিকল সেল অ্যানিমিয়া'। রক্তে একটু অক্সিজেন ঘাটতি থাকলে এই অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন সহজেই 'লম্বা চেন' তথা 'কাস্তে'-র মতো দেখতে হয়ে যায়, আর বিপত্তি ঘটায়। 'ভুল বিটা গ্লোবিন'-এর সংকেত বহনকারী জিনকে আমরা সহজ করে বলি 'সিকল সেল অ্যানিমিয়ার জিন'।

'অটোসোমাল' বোঝা গেল, কিন্তু 'অপ্রকট'?

সেক্স ক্রোমোসোম-এর জিনগুলো বাদ দিলে, সাধারণত জীবদেহে সব জিন থাকে ডবল ডোজে--- একই জিনের দুটো করে কপি থাকে জুড়ি-ক্রোমোসোমগুলোতে। তাদের একটা আসে মায়ের কাছ থেকে, আর একটা বাবার কাছ থেকে। বিটা গ্লোবিন-এর জিনও থাকে ডবল ডোজে, অর্থাৎ ১১ নম্বর ক্রোমোসোম-জোড়ার প্রতিটা ক্রোমোসোমে একটা করে বিটা গ্লোবিন-এর জিন তার একটা বাবার কাছ থেকে পাওয়া, অন্যটা মায়ের কাছ থেকে। এই দুটো জিন যে একরকম হবে তার কোনও কথা নেই— মায়ের কাছ থেকে আসা কোনও বিশেষ জিনে কোনও ত্রুটি থাকলে, বাবার কাছ থেকে আসা ওই বিশেষ জিনটায় সেই ত্রুটি থাকতেও পারে, আবার না-ও থাকতে পারে। এইবার আমরা 'অপ্রকট' কথাটা সহজে বুঝব। জিন থাকলেই কি সেই জিন-এর বৈশিষ্ট্য শরীরে ফুটে বেরোবে? সিকল সেল অ্যানিমিয়ার জিনটাই ধরি। আফ্রিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলে শতকরা ১০ থেকে ৪০ জন মানুষের শরীরে একটা করে সিকল সেল অ্যানিমিয়ার জিন আছে, কিন্তু বাচ্চাদের মাত্র ২ শতাংশ (মোটামুটি) সিকল সেল অ্যানিমিয়া নিয়ে জন্মায়। কেন বলুন তো?

এটা হল ওই 'অপ্রকট' গুণের কেরামতি। ধরুন, বাবার শরীরে একটা সিকল সেল অ্যানিমিয়ার জিন আছে, সেটা থাকে ১১ নম্বর ক্রোমোসোম-জোড়ার একটাতে একটা বিশেষ স্থানে। তার 'জুড়ি' ক্রোমোসোম, যেটা ওই ১১ নম্বর ক্রোমোসোম-জোড়ার অন্যটি, তাতে কিন্তু ওই বিশেষ স্থানটিতে স্বাভাবিক জিন আছে। যেহেতু রোগটা 'অপ্রকট', সেহেতু একটা মাত্র স্বাভাবিক জিন দিয়ে স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন উৎপাদন মোটামুটি চলে যায়, আর তাই বাবার শরীরে রোগের লক্ষণ প্রায় নেই বললেই চলে। 'অপ্রকট' না হয়ে 'প্রকট' রোগ হলে একটা মাত্র অস্বাভাবিক জিন থাকলেই বাবার পুরোমাত্রায় রোগ হত, সে কথায় এখনই আসছি না।

এখন মায়ের যদি সিকল সেল অ্যানিমিয়ার জিন একটাও না থেকে থাকে, তা হলে গড়ে অর্ধেক বাচ্চা বাবার কাছ থেকে একটা সুস্থ জিন ও মায়ের কাছ থেকে একটা সুস্থ জিন পাবে, ফলে তারা একেবারে স্বাভাবিক হবে। বাচ্চাদের বাকি অর্ধেক বাবার কাছ থেকে একটা সিকল সেল অ্যানিমিয়ার জিন পাবে, কিন্তু মায়ের কাছ থেকে সে স্বাভাবিক জিনই পাবে, ফলে তাদেরও রোগলক্ষণ দেখা দেবে না, কিন্তু তারা তাদের বাবার মতো 'রোগবাহক' হয়ে থাকবে। এই একটা নতুন কথা আমরা পাচ্ছি, 'রোগবাহক'। ছোঁয়াচে রোগের 'রোগবাহক' আমরা জানি, তাদের শরীরে রোগের জীবাণু থাকে, সে রোগে ভুগুক আর না-ই ভুগুক। জিনগত বা বংশগত রোগের ক্ষেত্রে সাধারণ ভাবে 'রোগবাহক' বলতে রোগ-আক্রান্ত নয় কিন্তু রোগের

১ এই তালিকায় অবশ্য সমস্ত জীব পড়ে না। যেমন ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে জিন থাকলেও, সেগুলো নিউক্লিয়াসে কয়েকটা নির্দিষ্ট সংখ্যায় ক্রোমোসোম থাকার ব্যাপারটা নেই। আমাদের আলোচনায় এই সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও দরকারও নেই।

জিন বহন করছে— এমনটাই বোঝায়।

এবার ধরুন, বাবা ও মা দুজনেই 'রোগবাহক'। যেসব জনগোষ্ঠীতে ১০ শতাংশ মানুষ 'রোগবাহক' সেখানে এটা খুবই সম্ভব। এই দম্পতির চারটি বাচ্চা হলে, গড়পড়তায় একটা বাচ্চা বাবা এবং মা দু'জনের কাছ থেকেই ভাল জিন পাবে, এবং সে পুরো রোগমুক্ত থাকবে। দু'টি বাচ্চা বাবা বা মায়ের কাছ থেকে একটা ভাল জিন পাবে, এবং অন্য জনের কাছ থেকে একটা খারাপ জিন পাবে, ফলে তারা দু'জনেই 'রোগবাহক' হয়ে জন্মাবে। এবার চতুর্থ বাচ্চার ব্যাপারটা দেখুন।[২] সে বাবা এবং মা দুজনের কাছ থেকেই একটা করে খারাপ জিন পাবে, তার শরীরে ভাল জিন বা ঠিকভাবে হিমোগ্লোবিন তৈরি করার মতো জিন একটাও থাকবে না, ফলে সে হবে সিকল সেল অ্যানিমিয়া রোগী। আগেকার দিনে এই সব রোগীরা বেশিদিন বাঁচত না, সন্তান উৎপাদন করা তো দূরস্থান, তাই এই রোগীদের বাচ্চা হলে তাদের কার কী হবে, সে প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাব না।

প্রাকৃতিক নির্বাচন ও সিকল সেল অ্যানিমিয়া

এবারে একটা জটিল প্রশ্ন এসে যায়। সিকল সেল অ্যানিমিয়ার 'রোগবাহক'-রা টিকে আছেন কী করে? তাঁদের নিজেদের মধ্যে যৌনসম্পর্ক করলে তাদের সন্তানদের সিকিভাগ বাঁচে না, অথচ সন্তানজন্মের ও ছোট বাচ্চাকে লালনপালন করার সমস্ত ঝক্কি তাদের নিতে হয়। অন্য 'স্বাভাবিক' দম্পতির তুলনায় তাঁদের কম সন্তান বেঁচে থাকবে, আর এই ভাবে তাঁদের বংশ ক্রমে লোপ পাবে, ডারউইনীয় তত্ত্বের 'সারভাইভাল অফ দি ফিটেস্ট' শব্দগুচ্ছ তো সেরকমই বলে। তা হলে? 'সারভাইভাল অফ দি ফিটেস্ট' কতটা ডারউইনীয় আর কতটা সত্যি সেই জটিল প্রশ্ন তুলছি না, কিন্তু এটা তো ঠিক হাজার হাজার বছর আগে এই রোগে কেউ বাঁচত না, আর জীবনযুদ্ধ এমন কঠিন ছিল যে মোট জনসংখ্যা কোনও রকম জন্মনিয়ন্ত্রণ ছাড়াই তেমন বাড়েনি। সবার বাঁচার সম্ভাবনা কি সমান ছিল? না, তা কিন্তু নয়। গড়পড়তায় অন্যদের তুলনায় শক্তপোক্তদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ছিল বেশি, আর তাদেরই সন্তানলাভের ও সন্তান মানুষ করার সম্ভাবনা বেশি ছিল। সুতরাং সিকল সেল অ্যানিমিয়ার 'রোগবাহক'-দের প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে টিঁকে থাকাটা এক আশ্চর্য ব্যাপার, প্রায় মিরাকল, তাই না?

আসলে এটা মোটেই আশ্চর্য ব্যাপার নয়। কেন নয়, কথাটাই আমাদের আজকের মূল গল্প। হিমোগ্লোবিনের একটা অংশ বিটা-গ্লোবিন, সেটা তৈরির সংকেত বহন করে ১১ নম্বর ক্রোমোসোমের একটা জিন। বৃহৎ জৈব-অণু ডিএনএ হল ক্রোমোসোমের মূল অংশ, আর জিন হল লম্বা ডিএনএ অণুর অংশবিশেষ।[৩] ডিএনএ-র লম্বা অণুটি অজস্র নিউক্লিওটাইড দিয়ে তৈরি, এই নিউক্লিওটাইডগুলো চার রকমের হয়। বিটা-গ্লোবিন জিন যে ডিএনএ-অংশ দিয়ে তৈরি সেই ডিএনএ অণুটির একটা সুনির্দিষ্ট জায়গায় একটা মাত্র 'নিউক্লিওটাইড' স্বাভাবিক জিন-এর চাইতে আলাদা হয়ে যাবার ফলে সিকল সেল অ্যানিমিয়ার উদ্ভব। এই একটা নিউক্লিওটাইড স্বাভাবিক বিটা-গ্লোবিন জিন-এর চাইতে আলাদা হওয়ার ফলে সেটা যে হিমোগ্লোবিন তৈরি করে, সেটা রক্তে অক্সিজেন কম থাকলে দ্রুত পলিমেরাইজ করে লম্বা সিকল তৈরি করে। তার থেকেই রোগের যত উপসর্গ ও লক্ষণ দেখা দেয়।

পৃথিবীতে যত সিকল সেল অ্যানিমিয়ার রোগী ও 'রোগবাহক' আছেন, তাঁদের প্রত্যেকের ওই একটা মাত্র নিউক্লিওটাইড-এ গণ্ডগোল বা মিউটেশন। স্বাভাবিক ডিএনএ-তে কোনও গঠনগত পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলে মিউটেশন। আর এই 'একটা মাত্র নিউক্লিওটাইড-এ মিউটেশন'-এর পোশাকি নাম হল সিঙ্গল নিউক্লিওটাইড পলিমরফিজম, সংক্ষেপে স্নিপ (SNP)। একটা নিউক্লিওটাইড অন্য রকম হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা তুলনায় বেশ সহজে ঘটতে পারে। বর্তমানে পৃথিবীতে যে সব সিকল সেল অ্যানিমিয়ার রোগী ও 'রোগবাহক' আছেন, তাঁদের রোগটা বাবা-মায়ের কাছ থেকে পাওয়া। কিন্তু এক সময় না এক সময়, অন্তত একজনের শরীরে স্বাভাবিক বিটা-গ্লোবিন জিনটাতে প্রথমবার এই মিউটেশন ঘটেছিল, এবং পরে তাঁর (বা তাঁদের) থেকে বিশ্বময় এটা ছড়িয়ে পড়ে। নানা টেকনোলজি ব্যবহার করে দেখা গেছে, একজন নয় বা একবার নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে অন্তত পাঁচ-পাঁচবার এই স্নিপ মিউটেশনটা ঘটেছিল। পৃথিবীর কোন জায়গায় ওই মিউটেশনটা ঘটেছিল সেটাও অনেকটাই জোর দিয়ে বলা যায়। আফ্রিকাতে এই মিউটেশন ঘটেছিল চার-চারটি জায়গায়--- সেই জায়গাগুলোর নাম অনুযায়ী এই মিউটেশনগুলোকে সিকল সেল অ্যানিমিয়ার ক্যামেরুন, বান্টু, বেনিন ও সেনেগাল ধরন বলা হয়। আর পঞ্চম ধরনটা হল আরব-ইন্ডিয়ান ধরন, সেটা ঘটেছিল এশিয়ায়। আফ্রিকার বেশিরভাগ মিউটেশন ঘটা নিয়ে যাঁরা বিস্মিত

২ 'চতুর্থ বাচ্চা' মানে এই নয় যে সে বাবা-মায়ের চার নম্বর সন্তান। বাবা-মায়ের চারজন সন্তান হলে এক নম্বর বা দু'নম্বর বা তিন নম্বর বা চার নম্বর— যে কোনও সন্তানই সিকল সেল অ্যানিমিয়া নিয়ে জন্মাতে পারে। কথাটা হল, চারজন সন্তান হলে, গড়ের উপর বলা যায়, এক জনের সিকল সেল অ্যানিমিয়া হবে, দু'জন আপাত-সুস্থ রোগবাহক হবে ও একজন পুরো সুস্থ হবে।

৩ ডিএনএ-র ঠিক কতটা অংশকে একটা জিন বলা যায় তা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক আছে, আমরা সে সবের মধ্যে ঢুকছি না; তবে আমরা এখানে যে কথাগুলো বলছি, সেগুলো সেই সব বিতর্কের ঊর্ধে।

হচ্ছেন তাঁদের বলে রাখা ভাল, মানবজাতির জন্ম আফ্রিকাতে, এবং মানব-প্রজাতি তার এতাবৎ আয়ুষ্কালের একটা বড় অংশ কাটিয়েছে আফ্রিকাতেই; সুতরাং এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

সিকল সেল অ্যানিমিয়া কি কোনও সুবিধা দিয়েছিল?

প্রশ্ন হল, যে মিউটেশন শরীরের উপর, বিশেষ করে সন্তান বেঁচে থাকার সম্ভাবনার উপরে, এত সাংঘাতিক প্রভাব ফেলে মিউটেশন এত দিন টিকে গেল কী ভাবে?? উত্তরটা জানতে গেলে দু'টো আপাত-অসংলগ্ন কথা জানতে হবে। প্রথম কথাটা হল, সিকল সেল অ্যানিমিয়ার 'রোগী' শৈশবে মারা গেলেও, 'রোগবাহক'-এর শারীরিক অসুবিধা সামান্যই, বিশেষ করে সমভূমিতে। দ্বিতীয় কথাটা হল, 'রোগবাহক'-এর শরীরে ম্যালেরিয়ার পরজীবী তেমন জুত করতে পারে না, ম্যালেরিয়া রোগ এদের মারতে পারে না। আসলে ম্যালেরিয়ার পরজীবী তার জীবনচক্রের একটা দশা কাটায় মানুষের লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে। সেখানেই যদি থাকে সিকল সেল অ্যানিমিয়ার বিকৃত হিমোগ্লোবিন, সেই লম্বাটে গড়নের হিমোগ্লোবিন ম্যালেরিয়ার পরজীবীর বংশবিস্তারে বাধা দেয়। তৃতীয় কথাটা এবার বোধ হয় সবাই ধরে ফেলেছেন— সেই সময়ে, আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে, আফ্রিকাতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল খুব বেশি, কোনও চিকিৎসা থাকার প্রশ্নই নেই, কারণ সে সময়ে মানুষ ছিল বনচারী, বৃক্ষবাসী বা গুহাবাসী, আর ম্যালেরিয়াতে মানুষ যেমন ভুগত, তেমন মরত।

কিন্তু ম্যালেরিয়ায় সবাই সমান মরতেন না। সিকল সেল অ্যানিমিয়ার 'রোগবাহক'-রা মরতেন না। ফলে তাদের বেঁচে থেকে বংশবৃদ্ধি করার সুবিধা হত। বংশবৃদ্ধি মানেই সিকল সেল অ্যানিমিয়ার জিন ছড়িয়ে দেওয়া। এভাবে জিন ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে এক সময় এক একটা জনগোষ্ঠীতে যখন অনেক সিকল সেল অ্যানিমিয়ার 'রোগবাহক' তৈরি হত, তখন তাঁদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক গড়ে ওঠার সম্ভাবনা বেড়ে যেত, ফলে সিকল সেল অ্যানিমিয়ার রোগী জন্মাতেন ও মরতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'গড়পড়তা হিসেবে' সিকল সেল অ্যানিমিয়ার 'রোগবাহক'রা বেশ ভালই চালাচ্ছিলেন, যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ খুব বেশি সেই সব জায়গায় 'রোগবাহক'-রা অন্যদের চাইতে গড়ে বেশি সন্তানসন্ততির জন্ম দিচ্ছিলেন; তাঁদের মধ্যে একটা অংশ অ্যানিমিয়ায় মারা গেলেও, সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে জনসংখ্যার একটা বড় অংশ সিকল সেল অ্যানিমিয়ার 'রোগবাহক' হয়ে উঠেছিল।

অতএব

জিন নিয়ে আলোচনায় একটা বড় অসুবিধা হল, কোনও জিনকে দ্রুত ভাল বা খারাপ জিন বলে চিহ্নিত করা যায় না কেননা, কোনও পরিবেশে সেই জিন জিন-বহনকারীর জীবনে কী ভূমিকা রাখবে, সেটা বলতে গেলে খালি জিনটির কাজ সম্পর্কে জানলে চলবে না, জানতে হবে সেই জিন ও বিগত সমস্ত পরিবেশের সঙ্গে তার বিক্রিয়া, জিন-জীবন-পরিবেশ ইতিহাস। যেমন মানুষের, বিশেষ করে ভারতীয়দের, ডায়াবেটিস হওয়ার প্রবণতা খুব বেশি বলে মনে হয়। মনে হয় প্রকৃতি তথা বিবর্তন যেন আমাদের ডায়াবেটিস বাঁধাবার জন্য সমস্ত জিনগত অবস্থান তৈরি করে রেখেছেন। ডায়াবেটিস অবশ্যই জিন-প্রভাবিত রোগ, কিন্তু তা মোটেও এক-জিনঘটিত রোগ নয় যে সিকল সেল অ্যানিমিয়ার মতো তার ইতিহাস এত স্পষ্টভাবে পাওয়া যাবে।

কিন্তু এটুকু বলাই যায় যে মনুষ্যপ্রজাতি তার বিবর্তনের একটা বড়ো সময় ধরে যে পরিবেশে থেকেছে সেটা আজকের পরিবেশের চাইতে একেবারে আলাদা রকম ছিল। ডায়াবেটিসের মূল ব্যাপারটা হল রক্তে শর্করা বেড়ে যাওয়া।

মানুষ তার লক্ষ বছরের বিবর্তনের একটা বড় সময় কাটিয়েছে এমন পরিবেশে যেখানে আজকের মতো শর্করাজাতীয় খাদ্যের প্রাচুর্য ভাবাই যেত না, আর বহুসময় তাকে কয়েক দিন টানা উপোস করে থাকতে হত। অথচ রক্তে শর্করা কমে গেলে মানুষের কর্মক্ষমতা ভীষণ কমে যায়, শর্করা বেশি কমলে মস্তিষ্ক যায় অচল হয়ে। সেই সময়ে যে মানুষটার রক্তে শর্করা বাড়িয়ে রাখার ক্ষমতা বেশি সেই মানুষকে ডারউইনীয় প্রাকৃতিক নির্বাচন বেশি সুবিধা দিয়েছে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের কোনও ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি নেই, সে জানে না লক্ষ বছর পরে সেই মানুষটার জিন বহনকারী বংশধর মিষ্টি আর বেশি খাবারের অতি-শর্করা পরিবেশে পড়বে, এবং সেদিনের রক্তে শর্করা বাড়িয়ে বাঁচিয়ে রাখার জিনটি সেই ভবিষ্যৎ-দিনে তার সমূহ সমস্যার কারণ হবে।

এইটুকু জেনে রেখে পরে জিন আর মানুষের জীবন নিয়ে আরও কথা বলে যাবে *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র পরের সংখ্যায়।

লেখক পরিচিতি : ডা. সুমিত্রন বসু, এমবিবিএস, রেডিও-ডায়াগনসিস বিষয়ে এমডি পাঠরত।

ADVERTISEMENT

একক মাত্রা

গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস
সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র
পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে
গ্রাহক চাঁদা:১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)
আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন
যোগাযোগ : ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭ দূরভাষ : ৯৮৩০২৩৬০৭৬ / ৯৮৩০৪৯৩২৩৯

গভীর রাতে বুকে ব্যথা হলে কী করণীয়?

রাতে বুকে প্রবল ব্যথা হলে আমরা ধরেই নিই, হার্ট অ্যাটাক। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে, এমন ব্যথার মাত্র ১২.৫ শতাংশের কারণ হার্ট তথা হৃদযন্ত্রঘটিত। সেগুলো সবই কিন্তু মারাত্মক নয়, মারাত্মক এবং ইমার্জেন্সি হৃদরোগ হল কেবল ১.৫ শতাংশ। সেই ১.৫ শতাংশের ক্ষেত্রে, ব্যথা শুরুর দু'ঘণ্টার মধ্যে করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম করে ইমার্জেন্সি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি ও স্টেন্ট বসানো সেরা চিকিৎসা। আমাদের দেশে প্রায় কারুরই দু'ঘণ্টার মধ্যে এত বড়ো ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তাই ওষুধ দিয়েই থ্রম্বোলাইসিস করতে হবে। সেটাও জীবনদায়ী। রয়ে-বসে 'ইমার্জেন্সি' অ্যাঞ্জিওপ্ল্যাস্টি করানো প্রায়শই রোগীর চাইতে হাসপাতালের 'স্বাস্থ্য' রক্ষা করে— লিখছেন **ডা. গৌতম মিস্ত্রী।**

প্রবন্ধের শিরোনামে নাটকীয়তা আরোপের একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার দায় স্বীকার করে বলি, বুকে ব্যথা শুরু যে কোনও সময়েই হতে পারে। বরং দেখা গেছে হৃদরোগের কারণে বুকে ব্যথা সাধারণত কাকভোরেই শুরু হয়। তবুও রাতবিরেতে বুকে ব্যথা হলে আমরা যতটা না ব্যথা পাই তার চেয়ে বেশি আতঙ্কিত হই। হৃদরোগ নয় তো? দেশে ও বিদেশে, বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালের আপৎকালীন পরিষেবার দ্বারস্থ হওয়া রোগীদের ৬০ শতাংশের বুকে ব্যথা কোনও শারীরিক রোগের (হৃদরোগ, ফুসফুসের রোগ বা অম্বলের রোগজনিত) জন্যই হয় না। ৩৬ শতাংশের ক্ষেত্রে বুকের ব্যথার কারণ বুকের মাংসপেশি বা হাড়ের ব্যথা। অম্বলের জন্য বুকের ব্যথা হয় কেবল ১৩ শতাংশ ক্ষেত্রে। বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে যাঁরা আসেন তাদের মাত্র ১২.৫ শতাংশের বুকের ব্যথার কারণ হল হৃদরোগ। যে দুই ধরনের হৃদরোগে বুকে হয় তার মধ্যে স্থিতিশীল ইস্কিমিয়া (chronic stable angina) ১১ শতাংশ ও সত্যিকারের প্রাণের আশঙ্কা আছে এমন হৃদরোগ (acute coronary syndrome, unstable angina, acute myocardial infarction) মাত্র ১.৫ শতাংশের মধ্যে দেখা যায়। সব মিলিয়ে ১০০ শতাংশের বেশি হয়ে গেল, সেটা কিন্তু হিসেবের ভুল নয়। যাঁদের বুকে ব্যথার শারীরিক কারণ থাকে, তাঁদের অনেকেরই একাধিক কারণে বুকে ব্যথা হয়— যেমন হৃদরোগ ও তার সঙ্গে অম্বলের গলাজ্বালার সহ-অবস্থান।

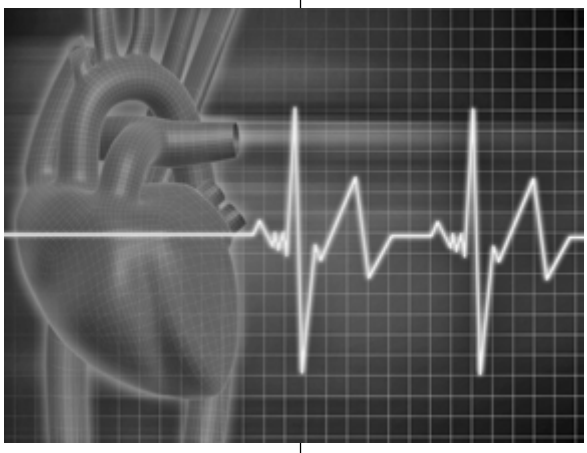

কিন্তু এই সব কথা তো বুকের ব্যথায় কাতর ও তার থেকে বেশি ভীত রোগীর বা রোগীর আত্মীয়পরিজনদের জানা থাকে না। অনেক সময় জানা থাকে না, গভীর রাতের হাসপাতালের আপৎকালীন বিভাগের আধোঘুমে আচ্ছন্ন প্রশিক্ষণরত ডাক্তারদেরও। দুঃখজনকভাবে ওই ১.৫ শতাংশ সম্ভাবনাকে মূলধন করে চলতে থাকে একের পর এক অন্তহীন জটিল থেকে জটিলতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর রোগী ও রোগীর আত্মীয়পরিজনদের অনিশ্চিত উৎকণ্ঠাপূর্ণ অপেক্ষা। সব সময় যে প্রমাণনির্ভর ও বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে সেই চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় করা হয় তা বলা যাচ্ছে না। বুকের ব্যথা হলেই যদি অ্যাঞ্জিওগ্রাম করা যায়, তবে অনেক ক্ষেত্রেই সরু হয়ে যাওয়া হৃদপিণ্ডের ধমনী নির্ণীত হতে পারে। কিছু কিছু চিকিৎসক আছেন যাঁরা রোগীর পরিজনকে ওই সরু হয়ে যাওয়া ধমনী দেখিয়ে বলেন, রোগীর প্রাণ বাঁচাতে বড় অপারেশন দরকার, দরকার অ্যাঞ্জিওপ্ল্যাস্টি, স্টেন্ট প্রতিস্থাপন। কিন্তু এই ধরনের সব ক্ষেত্রেই যদি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি ও স্টেন্ট প্রতিস্থাপন করা হয় সেটা সফল ও সর্বোত্তম চিকিৎসা হবে না। কেন হবে না, সেটা বুঝতে হলে পিত্তথলিতে পাথরের অপারেশনের থেকে হৃদরোগের সরু হয়ে যাওয়া রক্তনালীর অপারেশনের ফলাফলের পার্থক্য বুঝতে হবে। পিত্তথলির অপারেশনে রোগ চিরতরে নির্মূল হয়, দ্বিতীয়টাতে হয় না। সেটা অন্য আলোচনা। আমরা এখন বুঝে নিই, বুকে ব্যথা হলে সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতি কী হওয়া উচিত।

হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে ডাক্তার কী করবেন?

প্রথম আলোচনায় আমরা জানলাম, বুকে ব্যথা হলে খুব কম সংখ্যক ক্ষেত্রে (১.৫%) সেটা মারাত্মক হৃদরোগের কারণে হয়। যেহেতু হৃদরোগের সুচিকিৎসা শুরু না হলে অথবা বিলম্বিত হলে অপূরণীয় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে, তাই সঠিক কর্মপদ্ধতিটা এমন হবে যাতে সম্ভাবনা অল্প হলেও হৃদরোগের চিকিৎসা যেন অবহেলিত না হয়। আবার তেমনই প্রাথমিক পরীক্ষানিরীক্ষার পরে হৃদরোগের সম্ভাবনা যদি দিগন্তর পরপারে বিলীয়মান হয়ে যায়, তবে যেন রোগীকে উচ্চতর পরীক্ষার নামে রুদ্ধদ্বার চিকিৎসা যন্ত্রে পেষাই না করা হয়।

বুকে ব্যথা নিয়ে যখন কোনও রোগী ডাক্তার অথবা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পৌঁছোন, তখন চিকিৎসকের তাৎক্ষণিক কাজ হল হৃদরোগের সম্ভাবনা আছে কি না, তা নিরূপণ করা ও মারাত্মক হৃদরোগের অস্তিত্ব থাকলে যত শীঘ্র সম্ভব তার যথাযথ চিকিৎসা শুরু করে দেওয়া। তাৎক্ষণিক মারণাত্মক হৃদরোগের সম্ভাবনা না থাকলে, ধীরলয়ে চিকিৎসা করার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতি হল, প্রথাগত চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাঠ অনুযায়ী, প্রথমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকের বিশ্লেষক মনন নিয়ে রোগের

বিবরণ শোনা (analyzing history)। হৃদরোগের সম্ভাবনা বহুলাংশে রোগীর নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। রোগীর বয়স, লিঙ্গ, ধূমপানের অভ্যেস, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, স্থূলতা ইত্যাদি হৃদরোগের অনুকূল হলে হৃদরোগ অনুসন্ধান জোরদার করতেহবে। কেবল বুকের ব্যথার বিবরণ শুনে, ব্যথার ধরন থেকে, মোটামুটি ৮০ শতাংশ নিশ্চয়তা নিয়ে হৃদরোগের সম্ভাবনা আছে কি না জানা যায়। রোগীর বয়স ৩৫ বছরের কম হলে কেবল ৭ শতাংশ ক্ষেত্রে হৃদরোগের সম্ভাবনা, অথচ ৪০ বছরের বেশি বয়সের রোগীর ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা বেড়ে ৫০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। মারণাত্মক হৃদরোগের অস্তিত্ব নির্ণয়ের জন্য রোগের বিবরণ শোনার পর ই.সি.জি. এবং দু' একটা তাৎক্ষণিক ফল পাওয়া যায় এমন রক্ত পরীক্ষাই (Cardiac troponin) যথেষ্ট।

বুকের ব্যথার অন্যান্য মারাত্মক কারণ

বুকের ব্যথা কেবল যে হৃদরোগেই হয় তা নয়। হৃদরোগের অস্তিত্ব নেই বোঝা গেলে, হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকের পরবর্তী দায়িত্ব হল মারণ হৃদরোগের মতোই গুরুত্বপূর্ণ অন্য কোনও রোগের লক্ষণ আছে কি না তার খোঁজ করা। সেই রোগগুলো হল ফুসফুসের রক্তনালীতে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়া (pulmonary embolism), হৃদপিণ্ড থেকে নির্গত প্রধান রক্তনালীর দেওয়ালে ফাটল সংক্রান্ত রোগ (aortic dissection), ফুসফুস ও বুকের খাঁচার মধ্যে উচ্চ চাপযুক্ত হাওয়ার বলয় তৈরি হওয়া (tension pneumothorax)। এগুলো মারণাত্মক হৃদরোগের চেয়ে কম ভয়ঙ্কর নয়। আশার কথা এই রোগগুলো বেশ বিরল। যেহেতু চিকিৎসক ও রোগী উভয়েরই দৃষ্টিকোণ থেকে হৃদরোগের অস্তিত্ব দ্রুত ও সংশয়াতীতভাবে নির্ণয় অথবা তার আশঙ্কা নির্মূল করা গুরুত্বপূর্ণ, এই বিষয়টাতে আমরা এবারে মনোনিবেশ করব। পরে অন্য কোনও সংখ্যায় হৃদরোগ ছাড়া বুকে ব্যথার মারাত্মক কারণগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

খুব ব্যথা, কিন্তু রোগ নেই

হৃদরোগের অস্তিত্বের অনুসন্ধানের আগে, প্রথমেই উল্লিখিত ৬০ শতাংশের, অর্থাৎ ''যাদের বুকে বেশ ব্যথা কিন্তু কোনও শারীরিক রোগ নেই'' বলে উল্লেখ করা হয়েছে তার সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত না করলে পরবর্তী বক্তব্য সহজবোধ্য হবে না। এঁদের বুকের ব্যথা এতটাই যে মাঝরাতে হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগে স্বজন-পরিজন-আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত হয়ে হাজির হতে হচ্ছে। ই.সি.জি., কার্ডিয়াক এনজাইম, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ট্রেড মিল টেস্ট, করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি, পেটের আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, এন্ডোস্কোপি, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সকল পরীক্ষানিরীক্ষা করেও প্রমাণযোগ্য কোনও রোগ নির্ণয় করা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে অল্পবিস্তর আনুমানিক ও পরীক্ষামূলক ওষুধপত্রে রোগীর ব্যথা উধাও। রোগী ভাবেন গ্যাস বা অম্বলের ব্যথা, বিশেষজ্ঞগণ বলেন সাইকোসোমাটিক রোগের (psychosomatic disorder, somatization) ব্যথা। কী এই সাইকোসোমাটিক রোগ? আমরা জানি, আনন্দ ও উৎফুল্ল ভাবের মতো কষ্ট এবং ব্যথা অনুভূত হয় আমাদের মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অংশের সংবেদনে। সচেতন অথবা অবচেতন মনের কষ্ট, উদ্বেগ অথবা সহনশীলতার সীমার বেশি মানসিক চাপে অনেক সময়েই আমাদের বুকে এক ধরনের কষ্ট অনুভূত হয়। ব্যক্তি বিশেষের অনুভূতির তারতম্য অনুযায়ী এই কষ্ট ব্যথার উদ্রেক করে। আশার কথা, বিচক্ষণ চিকিৎসক তাঁর প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা দিয়ে অনেক সময় রোগীর কষ্টের বিবরণ থেকেই রোগ নির্ণয় করতে পারেন, ফর্দ মিলিয়ে একগাদা পরীক্ষা করতে হয় না। অধিক সতর্কতা ও বিধিসম্মত নিয়ম রীতি অনুযায়ী দু-একটা পরীক্ষাই (যেমন ই.সি.জি., কার্ডিয়াক এনজাইম) রোগীর সঠিক ও ভরসা জাগানো চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট। দুর্ভাবনার কথা এই যে, বুকের ব্যথার এই ধরনের মামুলি কারণে, চিকিৎসকের অজ্ঞতা অথবা তার চেয়েও দুর্ভাগ্যের, অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অসাধু প্রয়াসের শিকার হওয়ার ঘোর সম্ভাবনা থেকে যায়।

বুকের ব্যথার বিবরণ বিশ্লেষণ

চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচির প্রথম অধ্যায়েই যে কোনও রোগীর রোগবিবরণ লিপিবদ্ধ করা ও তার বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শেখানো হয়, রোগীর কেবল রোগবিবরণ শুনে ও বিশ্লেষণ করে কমপক্ষে ৫০ থেকে ৮০ শতাংশ নিশ্চয়তা নিয়ে রোগ নির্ণয় না করতে পারলে সেই চিকিৎসক বিস্তর পরীক্ষানিরীক্ষা করেও সাধারণত সঠিক রোগ নির্ণয় করতে সফল হন না। পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োজন কেবল নির্ণীত সম্ভাব্য রোগটা নিশ্চিত করা, রোগটার মাত্রা নির্ধারণের ও চিকিৎসা প্রক্রিয়ার ধারা নির্ণয়ের জন্য। হৃদরোগের জন্য যে বুকের কষ্ট হয় তার কতকগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণত হৃদরোগের বুকের কষ্টের উৎপত্তিস্থল আঙুল দিয়ে নির্দিষ্ট করা যায় না। মোটামুটি ভাবে বুকের মাঝখানে বেশ কষ্টকর এক ধরনের চাপ অনুভূত হবে— যেন একটা পাথর চাপানো আছে। সঙ্গে শ্বাসকষ্ট হতে পারে। সামান্য নড়াচড়া করলেই কষ্ট বেড়ে যাবে। অস্বাভাবিক ঘাম হতে পারে। রোগীর কষ্টের বিবরণ শোনার সময় রোগীর শারীরিক ভাষাও লক্ষ্য করা প্রয়োজন। সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার পর যে শারীরিক ভাষা হয় তেমনটা অভিজ্ঞ চিকিৎসকের নজরে পড়লে রোগ নির্ণয়ে ভুল হয় না। যে ধরনের ব্যথা হলে হৃদরোগের সম্ভাবনা খুব কম বলে বোঝা যায় সেগুলো হল আঙুল দিয়ে ব্যথার উৎপত্তিস্থল নির্দিষ্ট করা যায় এমন ব্যথা অথবা এক এক সময় বুকের এক এক জায়গায় অনুভূত হওয়া ব্যথা। যে বুকের কষ্ট বিশেষ করে রাতে শোবার পরে হয়, দিনের বেলা কাজের সময় থাকে না সে ব্যথা হৃদরোগের জন্য নয়। বেশ কিছুক্ষণ ধরে (ধরা যাক, আধ ঘণ্টার বেশি) প্রবল ব্যথা অনুভূত হলে সেটা হৃদরোগের জন্য হওয়া অস্বাভাবিক, কারণ সত্যিকারের হৃদরোগে বিনা চিকিৎসায় অতক্ষণ পেরিয়ে গেলে রোগী রোগ বিবরণ শোনানোর মতো অবস্থায় থাকেন না। হৃদরোগ ছাড়া অন্য রোগের আনুষঙ্গিক কষ্ট থাকলে তা রোগ নির্ণয়ে বিশেষ সাহায্য করে। যেমন জ্বর বা কাশি থাকলে ফুসফুসের সংক্রমণ সন্দেহ করতে হবে। খালিপেটে ব্যথা নিরাময়ের (analgesic, pain killer) ওষুধ গ্রহণ করলে খাদ্যনালী বা পাকস্থলীর প্রদাহ বা ক্ষত হয়েছে কি না খুঁজতে হবে। ব্যথার স্থানে আঙুল দিয়ে অল্প চাপ দিলে ব্যথা বেড়ে গেলে বুকের হাড়ের প্রদাহ (inflammation, costochondritis) সন্দেহ করতে হবে। এত কিছু পড়তে সময় লাগলেও, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকের রোগীর কষ্টের বিবরণ (ইতিহাস) শুনতে ও বিশ্লেষণ করতে (history taking and analyzing) বেশি সময় লাগে না।

রোগ নির্ণয়ের এই পর্যায়ের পরে সমস্যাটাকে তিন ধরনের সম্ভাবনায় ভাগ করা যায়— (১) প্রাণের সংশয় আছে এমন মারণাত্মক হৃদরোগ, (২) স্থিতিশীল সম্ভাব্য হৃদরোগ; ও (৩) হৃদরোগ নয় এমন স্থিতিশীল কোনও রোগ। নিশ্চিতভাবে মারণাত্মক হৃদরোগ নির্ণয়ের অথবা এর সম্ভাবনা বাতিল করার জন্য প্রয়োজন ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম বা সংক্ষেপে ই.সি.জি. এবং রক্তে মাত্রাতিরিক্ত কার্ডিয়াক ট্রোপোনিন নামক এবং উৎসেচকের উপস্থিতি নির্ণয়। মারণাত্মক হৃদরোগে আক্রান্ত (heart attack, acute myocardial infarction, acute coronary syndrome, unstable angina) হলে কিছুক্ষণের জন্য রক্ত সরবরাহ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হওয়ার কারণে হৃদপেশির কিছু কোষের মৃত্যু হয় আর মৃত হৃদপেশির কোষের মধ্য থেকে ওই উৎসেচক নির্গত হয়ে রক্তে মিশে যায়। অনেক সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার অব্যবহিত পরে ইসিজি-তে রোগ ধরা না গেলেও বুকে ব্যথা শুরু হওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই কার্ডিয়াক ট্রোপোনিন সঠিক ভাবে মারণাত্মক হৃদরোগ নির্ণয় করতে সক্ষম। সন্দেহ জোরালো হলে প্রথমে স্বাভাবিক ফল পাওয়া গেলেও কিছুক্ষণ পরে পুনরায় এই দুটো পরীক্ষা করে দেখা উচিত। রোগীর কষ্টের বিবরণ ও এই দুটো পরীক্ষায় মারণাত্মক হৃদরোগের সম্ভাবনা নির্মূল করা গেলে ধীরলয়ে বুকের ব্যথার অন্যান্য কারণ অনুসন্ধান প্রক্রিয়া চালু করতে হবে। এই রকম ক্ষেত্রে কর্পোরেট চিকিৎসা কেন্দ্রের মায়াজাল মুক্ত মানবিক ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ব্যবহারিক প্রয়োজনে সম্ভাব্য স্থিতিশীল হৃদরোগের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে অথবা তার সম্ভাবনা আছে এই সন্দেহ নির্মূল করার জন্য ট্রেডমিল টেস্ট এবং কখনও কখনও ইকোকার্ডিয়োগ্রাম যথেষ্ট বলে মনে করেন। গবেষণার প্রয়োজনে অবশ্য আরও কিছু পরীক্ষা করা হতে পারে।

মারাত্মক হৃদরোগের তাৎক্ষণিক চিকিৎসা—প্রাণ বাঁচানো

মারণাত্মক হৃদরোগ নির্ণীত হলে স্থান ও কাল অনুকূল হলে যত শীঘ্র সম্ভব কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন ল্যাবোরেটরিতে রোগীকে স্থানান্তরিত করে অ্যাঞ্জিও গ্রাম (পরীক্ষা) করে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করে স্টেন্ট প্রতিস্থাপিত করা (চিকিৎসা) উচিত। এই প্রক্রিয়ায় সফলতা পাওয়ার জন্য ব্যথা শুরু হওয়ার দু' ঘণ্টার সময় সীমার মধ্যে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি সেরে ফেলতে হয়। গ্রামাঞ্চলের কথা তো ছেড়েই দিলাম, আমাদের দেশের অনেক অতি বৃহৎ শহরেও মাঝরাতে এই কর্মযজ্ঞের কাণ্ডারীদের জড়ো করা এক সমস্যা। দু' ঘণ্টার মধ্যে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি সেরে ফেলার সম্ভাবনা না থাকলে এই অবস্থায় অ্যাঞ্জিওগ্রাম করাই অর্থহীন। যে সব হৃদ চিকিৎসকেরা কেবল হৃদরোগ নির্ণয়ের জন্য অ্যাঞ্জিওগ্রাম করার প্রয়োজন অনুভব করেন, তাঁদের পুনরায় প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা ছাড়া উপায় নেই।

তবে কি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি বিনা মারণাত্মক হৃদরোগের সুচকিৎসার কোনও বিকল্প উপায় নেই? কেবল আমাদের দেশেই যে আদর্শ চিকিৎসা প্রযুক্তি ও প্রয়োগযোগ্য পরিষেবার ফারাক তা নয়। সারা বিশ্বে এই সুবিশাল সংখ্যক মারণাত্মক হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের যে বিকল্প চিকিৎসা বন্দোবস্ত তার নাম ''জমাট বাঁধা রক্ত গলিয়ে দেওয়ার চিকিৎসা'' বা ''থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি''।

এই বিকল্প চিকিৎসার ফল অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির সমতুল্য এবং গ্রামেগঞ্জের হাসপাতালেও তা প্রয়োগযোগ্য। বিকল্প চিকিৎসা আদৌ নিম্নমানের কি না, সেটা বোঝার জন্য আদর্শ চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে প্রয়োগযোগ্য চিকিৎসা ব্যবস্থার তুলনা প্রাসঙ্গিক। তথ্যের উপর ভিত্তি করে হার্ট অ্যাটাকের পরে তড়িঘড়ি করে অ্যাঞ্জিওগ্রাম করার উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই তথ্য অনুসারে, হার্ট অ্যাটাকের পর বুকের ব্যথার শুরু হওয়ার সময় থেকে দুই ঘণ্টার মধ্যে সরু হয়ে যাওয়া হৃদপিণ্ডের রক্তনালী অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করে স্টেন্ট প্রতিস্থাপন করে ফেলতে পারলে বেশ ভাল রকমের দীর্ঘমেয়াদি সুফল পাওয়া যায়। কারণ এতে করে হৃদপেশির একটা বড় অংশ পাকাপাকিভাবে অকেজো হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করা যায়।

হৃদরোগ বিশেষজ্ঞগণ বলেন, ''time is muscle'' অর্থাৎ হার্ট অ্যাটাকের পর যত তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যাওয়া রক্তনালীকে উন্মুক্ত করা সম্ভব হবে তত পরিমাণের হৃদপেশিকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হবে। সমস্যা হচ্ছে, আমাদের এই মহানগরে বসেও হার্ট অ্যাটাকের পরে এই স্বল্প সময়সীমার মধ্যে এই প্রযুক্তি প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ চিকিৎসক, উন্নত মানের যন্ত্রপাতি, সদাজাগ্রত প্রশাসন ব্যবস্থা শতকরা ৫ জন রোগীর জন্যও করা সম্ভব হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা করা হয়ে থাকে ওই সুনির্দিষ্ট সময়সীমার বেশ পরে— যার উপকারিতা অপ্রমাণিত।

আমাদের দেশের মতো আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় বরং বিকল্প ''থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি'' বেশি কাজের বলে প্রমাণিত। উন্নত পশ্চিমী দেশেও আর্থিক ও ভৌগোলিক কারণে যখন হার্ট অ্যাটাকের পরে তৎক্ষণাৎ অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করে স্টেন্ট প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয় না, সে সব ক্ষেত্রে অ্যাম্বুলেন্সেই ''থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি'' শ্রেয়।

একটা ভ্রান্ত ধারণা কেমন করে জানি জনমানসে গেঁথে গেছে, কিন্তু জেনে রাখা দরকার, সব রকমের হার্ট অ্যাটাকের পরে অ্যাঞ্জিওগ্রাম করলে সরু হৃদপেশির ধমনীর (অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত বহনকারী রক্তনালী) অস্তিত্ব নির্ণয় করা যায় না, অর্থাৎ অ্যাঞ্জিওগ্রামের বিচারে স্বাভাবিক হৃদপেশির ধমনী থাকলেও হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকতে পারে। আবার অপরদিকে হৃদরোগের অস্তিত্ব না থাকলেও ভুল কারণে অ্যাঞ্জিওগ্রাম করলে অনেক সময়েই সরু হৃদপেশির ধমনীর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হতে পারে। সেই সব ক্ষেত্রে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করলে কোনও লাভ তো হবেই না বরং ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যাবে।

মারাত্মক হৃদরোগ না হলে?

মারণাত্মক হৃদরোগের সম্ভাবনা নির্মূল করা গেলে বুকের ব্যথার যে কারণগুলো বাকি রইল, তা হল স্থিতিশীল সম্ভাব্য হৃদরোগ ও হৃদরোগ নয় এমন স্থিতিশীল কোনও রোগ। প্রথমেই রোগী ও তাঁর পরিবারকে আশঙ্কামুক্ত করা জরুরি। পরে ধীর লয়ে প্রথাগত ভাবে রোগনির্ণয় প্রক্রিয়া চালু করা যেতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বুকের ব্যথার কষ্টের চেয়ে উৎকণ্ঠাই ভোগায় বেশি। ''বুকের ব্যথার কারণ মারণাত্মক হৃদরোগ নয়''— এই ভরসাই অনেক ক্ষেত্রে রোগীর রোগ উপশমের পক্ষে সহায় হয়। দূর থেকে দেখলে ভয়মিশ্রিত সমীহ হয় এমন তারামার্কা কর্পোরেট হাসপাতালের হালকা মোম আলোয় আলোকিত রং-বেরঙের মিটমিটে আলোওয়ালা যন্ত্রে ঠাসা ইনটেন্সিভ কেয়ার কক্ষের অভ্যন্তরে রোগী মানুষ হিসেবে হারিয়ে যায়, রোগীর কয়েকটা রোগ বৈশিষ্ট্য চিকিৎসকমন্ডলীর কাছে প্রাধান্য পায়— এরকম বললে হয়তো অনেক বিতর্কের শুরু হবে। কিন্তু ইতিহাস বলে সঠিক যন্ত্রের চেয়ে সঠিক যন্ত্রীই সব লড়াইয়ে জেতার মূল। বুদ্ধি ঘুলিয়ে দেওয়া যন্ত্র নির্ভর চিকিৎসা ব্যবস্থার চেয়ে আমাদের প্রয়োজন মানবিক, আর্থসামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাসঙ্গিক ও যুক্তিনির্ভর চিকিৎসা ব্যবস্থার।

(এই বিবরণ কেবল হৃদরোগের রোগ নির্ণয় প্রক্রিয়া বোঝানোর জন্য। আবেদন রাখব, কেউ যেন নিজের অথবা তাঁর কোনও পরিচিতের রোগ নির্ণয়ের জন্য এই তথ্যের উপর নির্ভর করবেন না। চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।)

সূত্র :

1. Klinkman MS, J Fam Pract 1994 : 38(4); 345, Episode of care for chest pain : a preliminary report from MIRNET, Michigan Research Network
2. Luke L.C, Cusack S. Smith H, et al. Non-traumatic chest pain in young aduits : a medical audit. Arch Emerg Med 1990; 7:183.
3. Pryor DB, Harrell FE Jr. Lee KL, et al. Estimating the likelihood of significant coronary artery disease.Am J Med 1983; 75-771.
4. Goldman L, Weinberg M, Weisberg M, et al. A computer-derived protocol to aid in the diagnosis of emergency room patients with acute chest pain. N Engl J Med 1982, 307-588.
5. Lee TH, Cook EF, Weisberg M, et al. Acute chest pain in the emergency room. Identification and examination of low-risk patients. Arch Intern Med 1985; 145 : 65.

লেখক পরিচিতি : ডা. গৌতম মিস্ত্রী, এমবিবিএস, এমডি, ডিএম (কার্ডিওলজি), হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, নিজস্ব ক্লিনিকে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

ADVERTISEMENT

With Best Compliment from

A. N. Pharmaceutical Laboratory

বমি

কত কারণে যে বমি হয়! বমির চিকিৎসা তাই বড় সোজা নয়। কিন্তু বমি নিয়ে আলোচনা করতেই যেন আমাদের নাক ঘেন্নায় কুঁচকে যায়— লিখছেন **ডা. পার্থপ্রতিম পাল।**

কথা হচ্ছিল স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে। এ বারে নৈনিতাল বেড়াতে গিয়ে সত্যি হুলুস্থুলু কাণ্ড, ছ'টা ফ্যামিলি এক সঙ্গে গিয়েছি। এক বন্ধু পত্নীর একেবারে যা তা অবস্থা। গাড়ি চললেই বমি, সারা রাস্তা ধরে, ওষুধ খেলেও কমছে না। অবস্থা এমন যে ওঁর নিজের ফ্যামিলি ছাড়া কেউ ওঁর সঙ্গে এক গাড়িতে যেতে চাইছে না। অগত্যা ওদের জন্য আলাদা গাড়ি বুক করতে হল।

আমার মেয়েটা ফাজিল। বলল, বমি করার আগে কাকিমা এমন বুক চেপে ধরে কাঁদছিল। জ্বলে গেল, পুড়ে গেল বলে চিৎকার করছিল, ওই গানটা গাইলেও পারত—।

কোনটা রে ঝিমলি? ওর মা সুন্দরী বন্ধু-পত্নী অপদস্ত হওয়ায় কেমন খুশি খুশি।

'বিড়ি জ্বালাইলে জিগর সে পিয়া, জিগর মে বড়ি আগ হ্যায়'— আমার ফাজিল মেয়েটা কত ফক্কড়, ভাবলাম। তবু সঙ্গীত তো আমার রক্তে!! রবীন্দ্রনাথ এত কিছু লিখে গেছেন বমি নিয়ে কিছুই লেখেন নি? ফাঁকা হাঁড়ি ঘেঁটে কিচ্ছু পাওয়া গেল না, অগত্যা ইতিহাস পরীক্ষার উত্তরপত্রের মতো নিজেকে বিস্তারিত করতে হল। 'বাব্বা— বমির আওয়াজের কী ঘটা, যেন ওই গানটা— এ কি গভীর বাণী এল, ঘন মেঘের আড়াল ধরে, সকল আকাশ আকুল করে—'। আমার বউ শুনছিল, হিন্দি ফিল্মের ভক্ত, টিপ্পনি কাটায় সেই বা কম কী সে, 'আর বমি করার পর, যা টলটল করছিল, যেন 'মন দোলে রে, তন দোলে রে ...।

বমি হওয়ার কারণ

অন্যের শারীরিক কষ্ট নিয়ে মজা করা বেশ কুরুচির পরিচয়। তবে কিনা সত্যি সত্যি আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী ও কন্যার এমন আলোচনা হয়নি। গল্পটার অবতারণা শুধু বোঝাতে, বমি মানুষকে কেমন অসহায় এবং অবাঞ্ছিত করে দেয়। বমি আমাদের সকলকেই কমবেশি করতে হয়েছে। পরীক্ষার খাতার কথা বলছি না। অম্বলে বা পেটের রোগে, ভরপেট খেয়ে আই ঢাই করতে করতে। কোনও খাবারে অ্যালার্জি থাকলে, অ্যাপেনডিক্স, কিডনি স্টোন বা গল ব্লাডারের রোগে। জন্ডিস বা প্যাংক্রিয়াটাইটিস রোগে বমি হতে পারে। মাথায় চোট লাগলে, টিউমার হলে, ভেতরে রক্তক্ষরণ হলে বমি হয়। মাইগ্রেনে বমি হতে পারে বা যে ঘটনা দিয়ে লেখাটা শুরু করেছি অর্থাৎ মোসান সিকনেস রোগে, অন্তঃকর্ণের মেইনার্স রোগেও বমি হতে পারে।

বিভিন্ন বিপাকজাত রোগ যেমন ইউরিমিয়া, হাইপোগ্লাইসেমিয়া, হাইপারগ্লাইসেমিয়া, অ্যাড্রিনালের ক্ষরণ কম হলে, রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা কমে গেলে বমি হতে পারে। গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে অনেকেরই বমি ভাব বা বমি হয়। একে বলে মর্নিং সিকনেস। অবস্থা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গেলে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার নাম হাইপারএমেসিস গ্রাভিডিভেরাম। আফিমজাতীয় ওষুধে, কেমোথেরাপি (ক্যানসার)-তে, মানসিক রোগের কোনও কোনও ওষুধে বমিভাব হতে পারে। তাছাড়াও প্রায় সব ওষুধেরই সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় বমি ভাব বা বমি হতে পারে। মদ খেলেও অনেকের বমি হয়। কেউ কেউ মদের তেতো স্বাদ, খারাপ গন্ধের জন্য বমি করেন, কারও কারও পাকস্থলীর প্রতিক্রিয়ার জন্য বমি হয়। বেশি মদ খেয়ে স্নায়বিক বৈকল্য হয়ে যায়— তখন বমি হতে পারে।

কী ভাবে বমি হয়?

আমাদের মস্তিষ্কে চতুর্থ ভেন্ট্রিকলের মধ্যে আছে বমনকেন্দ্র (vomiting centre), বমনকেন্দ্রের পাশপাশি রয়েছে রাসায়নিক গ্রাহক উত্তেজক এলাকা বা chemoreceptor trigger zone.

রক্তে কোনও রাসায়নিক যদি শরীরের ক্ষতি করার মতো ঘনত্বে পৌঁছে যায় তাহলে রাসায়নিক গ্রাহক উত্তেজক এলাকা বমনকেন্দ্রকে বমি করার নির্দেশ দেয়। অন্তঃকর্ণের ভেস্টিবুলার সিস্টেম আবার মোশন সিকনেস রোগের বমির জন্য দায়ী, অন্তঃকর্ণের নাড়াচাড়া হলে ভেস্টিবুলো- ককলিয়ার নার্ভ বমনকেন্দ্রকে বমি করার নির্দেশ দেয়। মুখের পেছনের দেওয়াল বা ফ্যারিঙ্কস-এ কোনও কারণে ইরিটেশন হলে ভেগাস নার্ভের মাধ্যমে বমি-বার্তা পৌঁছায় (গ্যাগ রিফ্লেক্স)। খাদ্যনালীতে স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন হলে যেমন কেমোথেরাপি, রেডিয়েশন থেরাপি, পেটের রোগ, ইত্যাদিতে ভেগাস নার্ভ ও এন্টেরিক নার্ভের মাধ্যমে বমনকেন্দ্রে বার্তা পৌঁছায়।

বমির নির্দেশ পেলেই শরীরের কতগুলো পরিবর্তন হতে থাকে। পাকস্থলীর উপরের দিকে দরজা খুলে যায়। নীচের দিকের দরজা বন্ধ হয়ে যায় যাতে পাকস্থলীর মধ্যে থাকা বস্তুগুলির উপরের দিকে উঠতে পারে। খাদ্যনালীর পেশিগুলি সঙ্কুচিত হয়ে পাকস্থলীর মধ্যে চাপ সৃষ্টি করে। উপরে ওঠা উগরে দেওয়া খাবার যাতে শ্বাসনালীতে ঢুকে না পড়ে সেজন্য শ্বাসনালীর উপরের দিকের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। বমি নাক, মুখ দিয়ে বাইরের দিকে বের হয়ে আসে। বমির সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর লালা নিঃসৃত হয় যাতে বমির অ্যাসিড দাঁতের এনামেলের ক্ষতি না করতে পারে। সঙ্গে ঘাম হয়। নাড়ির গতি বাড়ে।

বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেহেতু স্নায়ুর গঠন সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি, বা আচ্ছন্ন বা অজ্ঞান ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেহেতু স্নায়ুর উপর মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে না কোনও কোনও ক্ষেত্রে বমি শ্বাসনালীতে ঢুকে যেতে পারে। এটা প্রাণঘাতী

সমস্যা। সে জন্য শিশুদের বা অজ্ঞান ব্যক্তির বমি হলে মাথাটা নীচের দিকে করে রাখতে হয়, যাতে শ্বাসনালীতে বমি ঢুকে যেতে না পারে। কথা বলতে গেলে যেহেতু স্বরযন্ত্র ফাঁক হয়, শ্বাসনালীতে বমি ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই বমি করতে করতে কথা বলা বা বলার চেষ্টা করা উচিত নয়।

আরও কী কী কারণে বমি হতে পারে

- উৎকট গন্ধে, দৃশ্যে, খারাপ স্বাদে, অন্যকে বমি করতে দেখলে বমিভাব বা বমি হতে পারে।
- বুকে ব্যথা, উচ্চরক্তচাপ, হৃদযন্ত্রের রোগে, ম্যালেরিয়া ধরনের রোগে বমি হতে পারে,
- স্নায়ুঘটিত রোগে যেমন মেনিনজাইটিস, এনকেফেলাইটিস রোগ এবং মানসিক রোগ যেমন অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা বা বুলিমিয়া নার্ভোসা রোগে বমি হয়।

বমির প্রকৃতি

পাকস্থলীতে অ্যাসিড ক্ষরণ হয়। তাই বমির স্বাদ টক। অনেকেই চেম্বারে এসে সটান অভিযোগ করেন, 'ডাক্তারবাবু খুব অম্বল হয়েছে, টক বমি হচ্ছে।' প্রকৃতপক্ষে এ নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই, সাধারণত বমির স্বাদ টক-ই হয়। বমির রং রক্ত লাল হলে বোঝা যায় খাদ্যনালী ছিঁড়ে রক্ত বেরোচ্ছে, কালচে লাল থকথকে স্পঞ্জের মতো বস্তু বমির সঙ্গে বার হলে বুঝতে হবে পাকস্থলী থেকে প্রচুর রক্ত বার হয়েছে, রোগীকে এখন-ই হাসপাতালে পাঠাতে হবে। কফি রংয়ের বমি হলে বুঝতে হবে পাকস্থলী থেকে অল্প অল্প রক্ত বার হচ্ছে। হলুদ রংয়ের তেতো বমি মানে হচ্ছে পিত্তবমি, মানে পাকস্থলীর নিচের দরজা খোলা। ওখান থেকে পিত্ত বার হয়ে আসছে।

অনেক সময় বৃহদন্ত্র থেকে মল বমির আকারে মুখ দিয়ে বার হয়। একে বলে ফিকাল ভমিটিং বা copremesis। এ ধরনের বমি শ্বাসনালীতে ঢুকে পড়লে অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া হয়— প্রাণঘাতী।

বমি মুখ দিয়ে ফোয়ারার মতো বেরিয়ে এলে একে বলে প্রোজেকটাইল ভমিটিং। কোন কোনও বাচ্চা খাবার পরে এ ধরনের বমি করতে পারে। তার কারণ হতে পারে ইনফ্যান্টাইল হাইপারট্রফিক পাইলোরিক স্টেনোসিস।

বমি করিয়ে দেওয়া

বিষাক্ত কিছু খেয়ে ফেললে অনেক সময় বমি করিয়ে দিলে বমির সঙ্গে বিষাক্ত পদার্থ বার হয়ে যায়। বমি করিয়ে দেওয়ার এই চিকিৎসাকে সবসময় বিজ্ঞানসম্মত বলা চলে না। কারণ বহু বিষাক্ত পদার্থ খেয়ে ফেললেও বমি করানো নিষেধ।

গ্যাস রিফ্লেক্স

তর্জনী ও মধ্যমা মুখের ভিতর ঢুকিয়ে গলার পেছন দিক বা ফ্যারিঙ্কস-এ চাপ দিতে হয়। এতে বমির উদ্রেক হয় এবং বমি হয়। একে বলে গ্যাস রিফ্লেক্স। এক গ্লাস অল্প গরম জলে তিন চামচ নুন মিশিয়ে রোগীকে খাইয়ে দিলে বমি ভাব এবং বমি হয়। এটাও বমি করিযে দেবার একটা পদ্ধতি।

বিষক্রিয়া ও বমি

বিষ খেয়ে ফেললেই বমি করিয়ে দিতে হবে এ ধারণা ঠিক নয়।

ফেনা হয় এমন বস্তু যেমন শ্যাম্পু বা ডিটারজেন্ট অথবা পেট্রল, কেরোসিন তেল ইত্যাদি উদ্বায়ী রাসায়নিক খেয়ে ফেললে বমি করিয়ে দেওয়া একেবারেই নিষেধ। অ্যাসিড বা অন্য করোসিভ খেয়ে ফেললেও বমি করানো নিষিদ্ধ। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মুখে আঙুল ঢুকিয়ে বমি করাবার চেষ্টা করলে বড় আঘাত হয়ে যেতে পারে, বাচ্চাদের বেশি নুনজল খাওয়ালেও অনেক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। প্রসঙ্গত বিষক্রিয়া প্রশমনের জন্য কাঁচা ডিম, সাবান, নুনজল, সর্ষে, ভিনিগার, বেকিং সোডা ইত্যাদি খাওয়াতে যাবেন না। কেউ কেউ বিষ তরল করে দেওয়ার জন্য বেশি করে জল খাওয়াতে চান— যা কোনও কোনও ক্ষেত্রে শরীরে তাড়াতাড়ি বিষ ঢোকাতে সাহায্য করে।

অ্যালকোহল পয়জনিং

বেশি মদ খেলে শারীরিক এবং মানসিক বৈকল্য আসে। ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে পড়ে, তখন বমি হলে বমি শ্বাসনালীতে ঢুকে গিয়ে শ্বাস বন্ধ করে দিতে পারে। অ্যালকোহল রক্তনালীর প্রসারণ ঘটায়, ফলে শরীরের তাপমাত্রা কমে যায়। রক্তচাপ কমে যায়। এ অবস্থায় বমি হলে অবস্থার আরও অবনতি হয়।

চিকিৎসা

বারবার বমি হলে শরীরে জলের পরিমাণে টান পড়ে (ডিহাইড্রেশন) শরীরে খনিজের মাত্রার তারতম্য হয় (ডিসইলেক্ট্রোলাইটেমিয়া)। তখন রক্তনালীতে স্যালাইন দেওয়ার দরকার হয়ে পড়ে।

বারবার বমি হলে শরীরে ক্লোরাইড কমে যায় এবং বাই-কার্বনেট ও কার্বন-ডাই অক্সাইড বেড়ে যায়— ফলে রক্তের ক্ষারত্ব (pH) বাড়ে। এর সঙ্গে রক্তে পটাশিয়াম কমে যেতে পারে (হাইপোক্যালিমিয়া)—একে বলে মেটাবলিক অ্যালক্যালোসিস।

বারবার বমি হলে, বমি করার চাপে এবং বমির সংস্পর্শে খাদ্যনালীর গায়ে ছোট ছোট ক্ষত তৈরি হয়। একে বলে ম্যালোরি ওয়েইস ক্ষত (Mallory Weiss Tear)। এতে বমির সঙ্গে রক্ত বার হয়।

বমি হলে কী ওষুধ দিতে হবে সেটা ডাক্তারবাবুর ব্যাপার, তবে বমি হতে থাকলে সাধারণ মানুষ কী করতে পারে একথা আলোচনা করা যায়।

১. বমি হলে শরীর থেকে জল ও লবণ বার হয়ে যায়। যে পরিমাণ বমি হচ্ছে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ ORS খাওয়াতে হবে। ORS খাওয়ালে বমি বেশি হচ্ছে সে অজুহাতে ORS বন্ধ করলে চলবে না। প্রয়োজনে বার বার একটু একটু করে খেতে হবে।

২. আগে থেকে চলছে যদি এ রকম কোনও ওষুধ থাকে তবে সে ওষুধ সাময়িক বন্ধ রাখতে হবে। এ ব্যাপারে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

৩. বমি ভাব চলে না যাওয়া পর্যন্ত শক্ত খাবার খাওয়া বারণ।

৪. গর্ভাবস্থায় 'মর্নিং সিকনেস' হলে সকালে বিছানা থেকে নামার আগে অল্প কিছু খেতে হবে। রাত্রে শোবার আগে বেশি প্রোটিনযুক্ত খাবার, যেমন চিজ, চিকেন স্যুপ খেতে হবে।

৫. ক্যানসার কেমোথেরাপির সময় বমি বা বমি ভাব হতে পারে। Ondansetren tab 4 mg/8mg জিভের তলায় দিলে উপকার পাওয়া যাবে। অবশ্যই ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিতে হবে।

৬. বমি বা বমি ভাব কমানোর জন্য ডাক্তারবাবুরা ডোমপেরিডন, প্রোমিথাজিন বা প্রোক্লোরপেরাজিন ওষুধগুলি ব্যবহার করেন।

বমি এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা, এর মধ্যে আবেগ, কবিত্ব বা কল্পনা নেই। মেঘনাদবধ কাব্যে মাইকেল মধুসূদন কোনও এক জায়গায় নারকী বমন করে উদ্গীর্ণ পদার্থ আবার খাচ্ছে—এ রকম লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটা লেখায় ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন মাত্র, বমি নিয়ে তাঁর বিস্তারিত কিছু লেখা আমার চোখে পড়েনি।

বমির কথা বলতে গেলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লোকাচারের কথাও বলতে হয়। একটা কালো কুকুরকে কদিন না খাইয়ে উৎসবের দিন প্রচুর ভাত খাওয়ানো হয়। তারপর তার মুখে একটা বাঁশ পুরে তাকে বমি করান হয়। পূর্ণ ভোজের আগে সেই বস্তু নিমন্ত্রিতদের পরিবেশন করা হয়। কুকুরটিকে মেরে তার মাংস খাওয়া তো হয়ই।

ব্যাপারটা চিন্তা করলে অনেকেরই গা ঘিন ঘিন করতে বাধ্য। তবে এ হেন বমিকে নিয়েও আহ্লাদিত হতে পারি আমি আপনি সবাই। কবিতা গানে কল্পনায় যে বস্তুটিকে নিয়ে বারংবার উচ্ছ্বসিত হয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। আমি বলছি মধুর কথা। মধু মানে তো মৌমাছির বমি—ফুলে ফুলে রস খেয়ে খাদ্যনালীতে কিছুক্ষণ রেখে অর্ধেক হজম করে সেই রস উগরে দেয় মৌমাছি। সেটা নিয়েই রবি-কবি লেখেন— 'মধু গন্ধে ভরা মৃদু স্নিগ্ধ ছায়া নীপকুঞ্জ তলে'। অথবা, 'আমার নীরব বেলা সেই তোমারি সুরে সুরে ফুলের ভেতর মধুর মতো উঠবে পুরে।'

তব্বে!! বমি কী যা তা জিনিস। আমার-ই ভুল হয়েছিল। বমির দোষে দুষ্ট বন্ধুপত্নীকে যখন তার নিজের লোকেরাই প্রায় র‍্যাগ করেছিল। এ সময় আমি ঐ গানটা গাইতে-ই পারতাম। 'নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে তারি মধু কেন মনমধূপে খাওয়াও না।'

—কতটা রোমান্টিক হতে পারত ব্যাপারটা। প্রাপ্তির ভাঁড়ারে স্ত্রী-পুত্র কন্যার নির্দয় প্রহার-ও ছিল গ্যারান্টিড।

লেখক পরিচিতি : ডা. পার্থপ্রতিম পাল, এমবিবিএস। জেনারেল প্র্যাকটিস করেন। শ্রমজীবী মানুষের জন্য গড়ে ওঠা হাওড়ার একটা ক্লিনিকেও চিকিৎসা করেন।

ADVERTISEMENT

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

উৎস মানুষ

প্রাপ্তিস্থান :

দীপক কুণ্ডু, ২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২ বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), বইকল্প, ১৮ বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১।

যোগাযোগ : ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com

ফোন- ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬

শীত গ্রীষ্মে সান্দাকফু

সান্দাকফুই বলুন আর গোমুখই বলুন, সেখানে মানুষ সাধারণত যায় গরমকালে। তবে শীতের সময় যে যাওয়া যাবেই না, তা তো নয়। যখনই যান, কতকগুলো সাবধানতা অবলম্বন করতে ভুলবেন না। নিজে ঠেকে শিখে সে কথা আপনাদের শেখাচ্ছেন **ডা. সূর্যেন্দু বিকাশ খাটুয়া।**

প্রথমে গরমে

২০১৩-র এপ্রিল মাস। কলকাতায় বেশ গরম পড়েছে। চ্যাটচ্যাটে বিরক্তিকর গরম আর গরম হাওয়া। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনটাও কী রকম হাঁসফাঁস করে উঠছিল। এই রকম সময়েই যেন মনটা পাহাড়ি সবুজ, ঠান্ডা আর সরলতার ঘ্রাণের জন্য উসখুস করে। ৬ জন বন্ধু মিলে প্ল্যান করা শুরু হল— সান্দাকফু ট্রেকিং করার জন্য। আগে বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই দার্জিলিং, গ্যাংটক, সিমলা ঘুরে এসেছে। তবে সেগুলো গাড়িতে করে সুরক্ষিত পরিবেশে, কখনও কখনও কাঁচের ভিতরে থেকে সবুজের স্নেহ নেওয়ার চেষ্টা। জীবনের প্রথম ট্রেকিং ৬ জন বন্ধুর প্রায় সকলের। খোঁজখবর নেওয়া শুরু হল— গাইড খোঁজা, ট্রেনের টিকিট কাটা, শুকনো খাবার-দাবার কেনা, শীতের পোশাক জড়ো করে প্যাকিং করা— সবই মোটামুটি সময় মতো হল। ট্রেনে গল্প করতে করতে রাত কাটিয়ে জলপাইগুড়ি, তারপর সেখান থেকে শিলিগুড়ি পৌঁছে গেলাম। আগে থেকে বুক করে রাখা একটা গাড়িতে করে রিম্বিক (সিকিমের একটা গ্রাম)-র উদ্দেশে রওনা দেওয়া হল। তিস্তার পাশ দিয়ে পাকদণ্ডী পথে জিপ এগিয়ে চলেছে সুকনার যুদ্ধের সাজ আর জঙ্গলের মন-মাতানো গন্ধের বৈপরীত্য পেরিয়ে। ঘণ্টা দুয়েক যাওয়ার পর কয়েক জনের গা-গুলোতে শুরু করল। পরদিনের ট্রেকিং-এর উত্তেজনায় খাওয়ার কথাটা বেমালুম ভুলেই গেছিলাম। তাই গা-গুলোনো ব্যাপারটা বেশ বিশ্রী পর্যায়ে গিয়ে কয়েকজনের বমি শুরু হল। পাহাড়ি পাকদণ্ডী পথে অনবরত দৃশ্যপট পরিবর্তন হচ্ছে আর অন্যদিকে শরীরটা জিপে করে এগিয়ে চলেছে। আমাদের অন্তঃকর্ণ এগিয়ে চলার সংবাদ মস্তিষ্কে পৌঁছে দিচ্ছে। চোখের সামনে দৃশ্য পটের পরিবর্তন, শরীরের জিপে আপাতত স্থিত হয়ে বসে থাকা আর অন্তঃকর্ণের এগিয়ে চলার সংবাদ সবই 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো'-এর মতো মস্তিষ্কে পৌঁছে সব গুবলেট করে দিচ্ছে। ফলত মস্তিষ্কের বমি নিয়ন্ত্রণকারী কেন্দ্র উত্তেজিত হয়ে উঠেছে আর গা-গুলোনো, বমি হচ্ছে। তার ওপর আবার সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি।

জিপের ভিতর কী রকম দম বন্ধ হয়ে আসছিল। রাস্তার ধারে একটা ফাঁকা জায়গায় সবাই নামলাম, শুকনো খাবার যা ছিল, ভাগ করে সবাই মিলে খেলাম। খালিপেটে সকাল থেকে থাকা একেবারেই উচিত হয়নি। খালিপেটে থাকলে কিংবা বেশি মশলাযুক্ত খাবার খেয়ে এই পাকদণ্ডী রাস্তায় জিপে গেলে বমি হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। যারা বমি করছিল, তাদের অ্যান্টি হিস্টামিনিক জাতীয় ওষুধ দিলাম আর জিপের সামনের সিটে বসতে বলে গাড়ির জানালা খুলে দিতে বললাম।

এই সময় মোবাইলে ভিডিও না দেখে, কোনও কিছু পড়ার চেষ্টা না করে সামনে দূরের দিকে তাকিয়ে থাকলে বমির সম্ভাবনা কমে। এই ধরনের motion sickness-এর প্রবণতা কমানোর জন্য গাড়িতে ওঠার ৩০-৪০ মিনিট আগে ওষুধ খাওয়া উচিত ছিল। তা আমরা ভুলে গেছিলাম। বমি শুরু হওয়ার পর ওষুধ খেলে অতটা ভালো কাজ করে না।

গাড়ি করে আরও দূরে

গাড়িতে সবাই চেপে বসলাম। আবার চলা শুরু। চড়াই-উতরাই, সাপ-লুডোর মতো আঁকাবাঁকা রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে চলেছি। ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠছি বুঝতে পারলাম— নদীর গতিপথ সরু হয়ে আসছে আর কানের মধ্যে কী রকম অস্বস্তি হচ্ছিল— কানে তালা লেগে যাচ্ছিল। বায়ু চাপের তারতম্যের সমস্যার জন্য কানের এই অবস্থা। অনবরত বেশ কয়েকবার ঢোঁক গিলতেই ইউস্টেচিয়ান টিউবের ভিতর দিয়ে হাওয়া ঢুকে কানের পর্দার দু'পাশে বায়ু চাপের সাম্যাবস্থা তৈরি হল আর অস্বস্তিকর অবস্থাটা চলে গেল। অবশেষে বিকাল ৩টার দিকে ক্লান্ত দেহে রিব্ধি পৌঁছোলাম। গাড়ির ভিতর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, উঠে দেখি মুষলধারে

বৃষ্টি হচ্ছে। গাইড আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। বৃষ্টির মধ্যে কোনও রকমে মালপত্র নামিয়ে একটা দোকানে ঢুকে খাবারের আয়োজন শুরু হল। খিদেয় তো পেট চুঁইচুঁই করছে। আবহাওয়া বেশ খারাপ, তার ওপর রিব্ধিতে থাকার জায়গা নেই। তাড়াতাড়ি খেয়ে সামাদীনের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। পাহাড়ে তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা নামে, তার ওপর মেঘলা আকাশ, রাস্তা বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট পিছল হয়ে গেছে, অনভ্যস্ত পদক্ষেপে বেশ কয়েকজন আছাড় খেলাম। গাইড আমাদের জন্য গাছের শুকনো ডাল কেটে লাঠি বানিয়ে দিল— অনেকটা বিদেশিদের হাইকিং রডের মতো দেখতে হল। যাই হোক, এবার পথ চলতে খানিকটা সুবিধা হল। বৃষ্টি টিপটিপ করে পড়ে চলেছে। সবার কাছে রেনকোট বা ছাতা ছিল না। জামাকাপড় ভিজে এবার শীত শীত করছে। পাহাড়ি জায়গায় যে কোনও সময় আবহাওয়া খারাপ হতে পারে। প্রতি ১০০০ ফুট উচ্চতায় তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি ফারেনহাইট কমে যায়। তাই পাহাড়ে ঘুরতে যাওয়ার আগে প্রয়োজনমতো শীতের পোশাক, পারলে অতিরিক্ত কিছু পোশাক, গ্লাভস, মোজা, টুপি নেওয়া খুব জরুরি। হাড়ে হাড়ে সেটা টের পাচ্ছিলাম। এই ধরনের হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে বুকে বা গলায় সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই আগে থেকে সতর্ক হওয়া খুব জরুরি। কোনও মতে সন্ধ্যে ৭টায় সামাদীন পৌঁছালাম। মোমবাতির আলোয় ভিজে জামাকাপড় শুকিয়ে তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম। পরদিন তো আসল ট্রেকিং শুরু হবে।

পাহাড় ভাঙার খাটাখাটনি

সকালে ঘুম থেকে উঠে বুঝলাম, গতরাতে অন্ধকারের মধ্যে অল্প আলোয় ঘন জঙ্গল পেরিয়ে আমরা ৬০০০ ফুট উচ্চতায় এক সবুজ উপত্যকায় পৌঁছেছি। চারিদিকে মটরের ক্ষেত আর অল্প কিছু বাড়িঘর। সকালে খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ওপরের দিকে উঠতে উঠতে হাঁপিয়ে যাচ্ছি আর ঘামে শরীরটা ভিজে যাচ্ছে। ৩-৪টে স্তরে যে জামাকাপড় পরেছিলাম, তা একে একে খুলতে হল। এই সময় গরম লাগছে বলে সমস্ত জামাকাপড় একবারে খুলে ফেলা উচিত নয়।

সমুদ্র সমতলে বাতাসে যে পরিমাণ অক্সিজেন থাকে, উপরের দিকে উঠতে থাকলে বাতাস পাতলা হয়ে যায়, তাই বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমতে থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসে কম অক্সিজেন পৌঁছোয়। এই সমস্যা কাটানোর জন্য শরীরে নিজে থেকে শ্বাসপ্রশ্বাস এবং হৃদ্‌স্পন্দনের গতিবেগ বেড়ে যায়। মাংসপেশিতে কম অক্সিজেন পৌঁছোয়, তাই তাতে ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড জমতে থাকে এবং গা হাত পা ব্যথা হতে শুরু করে। কিছুটা উচ্চতা উঠে তাই মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেওয়া দরকার। এতে ল্যাকটিক অ্যাসিড মাংসপেশিতে কমে যায় এবং মাংসপেশি কর্মক্ষমতা ফিরে পায়। ওঠার সময় শক্তিক্ষয় হয় বলে খুব তাড়াতাড়ি ক্লান্ত লাগে। ওপরে ওঠার পরিশ্রম আর শুকনো আবহাওয়ার কারণে ঘামের মাধ্যমে জল আর লবণ বেরিয়ে যায়। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিয়ে আমরা নুন, চিনি, লেবুর সরবত খাচ্ছিলাম। পাহাড়ে ওঠার সময় যথেষ্ট পরিমাণে জল খেতে হবে। যদি প্রস্রাবের পরিমাণ কম হয় এবং রঙ গাঢ় হয়, তবে বুঝতে হবে যথেষ্ট পরিমাণে জল খাওয়া হচ্ছে না। এতে সমস্যা বাড়বে এবং খুব তাড়াতাড়ি ক্লান্তি চলে আসবে। শুকনো ফল, টাটকা সবুজ শাকসবজি, টমেটো, কলা, রুটি এগুলো খেতে হবে। ময়দার তৈরি রুটির বদলে গম থেকে তৈরি রুটি

খাওয়া বেশি লাভজনক। কারণ, এই ধরনের উচ্চ শর্করাযুক্ত জটিল খাবারগুলো ধীরে ধীরে হজম হয়ে অনেকক্ষণ ধরে শক্তি জোগায়। মদ্যপান করা বা ধূমপান করা একেবারেই উচিত নয়। অ্যালকোহল শরীরে জল এবং অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে শরীরে এদের মাত্রা কমিয়ে দেয়। ঠান্ডা হাওয়া নাক দিয়ে ফুসফুসে ঢোকে বলে বেশি পরিমাণে শ্লেষ্মা তৈরি হয় আর নাক দিয়ে জল পড়তে থাকে। ধূমপান এই সমস্যা আরও বাড়িয়ে দেয়। ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা আটকাতে চলার পথে আমরা মুখে মাস্ক বেঁধে নিলাম আর শরীরে এক প্রস্ত জামা চাপিয়ে নিলাম। এক সময় ঠান্ডা হাওয়ার প্রকোপে হাত জমে যাচ্ছিল, আমরা গ্লাভস্ পরে নিলাম। উল্টোপথে নেমে আসা একজন পর্বতারোহী বলল, ফালুটে বরফ পড়ছে।

এপ্রিল মাসে এই জায়গাটা নানা রঙের রডোডেনড্রন ফুলে ভরে যায়। রডোডেনড্রনের পাপড়ি বিছানো রাস্তা আমরা চলার পথে অনেক জায়গায় পেরিয়ে এসেছি। তার সঙ্গে বরফে ঢাকা রাস্তা! এক অবিশ্বাস্য সৌন্দর্যের মেলবন্ধনের আশায় নতুন উদ্যমে আমরা ফালুট-এর উদ্দেশ্যে এগিয়ে চললাম। প্রথমে রাস্তার পাশে এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকা বরফের টুকরো দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম। এক সময় দেখলাম পুরো রাস্তাটা বরফে ঢাকা, পা ডুবে যাচ্ছে বরফের মধ্যে। আর এক প্রস্ত জামাকাপড় চাপিয়ে গ্লাভস্ পরা হাত পকেটে ঢুকিয়ে এগিয়ে চললাম। এসে পৌঁছোলাম বরফে ঢাকা এক বিস্তীর্ণ উপত্যকায়। চারিদিকে এত কুয়াশা, সামনের পাঁচ হাত দূরে থাকা লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না। একটু আগেই পায়ের তলায় বরফ আর মাথার ওপরে কাঠফাটা রোদ ছিল। সে সময় রোদচশমাটা খুব কাজে দিয়েছিল, এখন তা খুলতে হল। পাহাড়ি জায়গায় সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাব খুব বেশি। তা ছাড়া, বরফে প্রতিফলিত হয়ে তার তীব্রতা বেড়ে যায়, রোদচশমা পরা তাই জরুরি। তা না হলে চোখের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

অনেক কষ্টে কুয়াশার ঘন অন্ধকারের মধ্যে আমরা ট্রেকার হাট খুঁজে পেলাম— ১১০০০ ফুট-এর বেশি উচ্চতার ফালুট-এ এসে পৌঁছালাম। আসার সময় বরফে পা ডুবে যাচ্ছিল, ফিরে দেখি জুতো, মোজা ভিজে গেছে আর জুতোর মধ্যে কিছু বরফের টুকরো। জুতো, মোজা খুলে শুকোতে দিলাম। এই রকম জায়গায় গ্লাভস্ বা মোজার মধ্যে বরফ ঢুকে চামড়ার ওপরে বরফের কেলাস তৈরি হয়। অধিক ঠান্ডার ফলে আঙুলে, হাতে পায়ের রক্তনালী সংকুচিত হয়ে যায় এবং কোষে অক্সিজেন সরবরাহ কমে যায়। এর থেকে ফ্রস্টবাইট হতে পারে। হাত, পা, আঙুল ঝিনঝিন করে, অবশ হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ করে হাত-পা গরম না করে ধীরে ধীরে গরম করা উচিত এবং সম্ভব হলে যে ঘরে থাকছেন, তার তাপমাত্রা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা উচিত।

পরদিন সকালে আবহাওয়া আরও খারাপ, গুঁড়ি গুঁড়ি তুষারপাত হচ্ছে। এর মধ্যে আমাদের এক বন্ধুর শারীরিক ক্লান্তি চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে, সবাইকে নিয়ে আমাদের পূর্ব পরিকল্পিত সান্দাকফু যাওয়া সম্ভব বলে মনে হল না। আমরা পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনলাম এবং ঠিক করলাম মোলে হয়ে শ্রীখোলা নেমে আসব। দলে কোথাও ঘুরতে গেলে (বিশেষ করে পাহাড়ি জায়গায়) দলের প্রত্যেক সদস্যকে শারীরিক ভাবে সুস্থ থাকা যেমন জরুরি, তেমন প্রয়োজন মতো ভ্রমণসূচির পরিবর্তনও খুব জরুরি। অকারণ বীরত্ব দেখিয়ে এগিয়ে যাওয়াটা খুব বোকামি এবং বিপদের কারণ হতে পারে। অনেক অভিজ্ঞ পর্বতারোহী ঝোঁকের মুখে এই রকম সিদ্ধান্ত নিয়ে বিপদের মুখে পড়েছেন। দলের কোনও সদস্য অসুস্থ থাকলে সেটাকে আগে গুরুত্ব দিতে হবে।

আমরা সান্দাকফু যাওয়ার রাস্তায় মোলেতে নেমে এলাম এবং প্রায় সারাদিন আর রাত বিশ্রাম নিলাম। পরের দিন আমরা শ্রীখোলা নেমে এলাম, পরে অন্য কোনও সময় আমাদের অসমাপ্ত সূচি পূর্ণ করার আশা নিয়ে। শ্রীখোলা দার্জিলিং-এর প্রান্তিক প্রায়। নদীর নামেই এই নাম। পাহাড়ি ভাষায় খোলা মানে নদী। ফিরে এসে একটা হোটেল ঠিক করে আমরা সবাই নদীর ধারে আড্ডা মারতে চলে গেলাম। চকচকে পরিষ্কার শ্রীখোলার জল এবং বেশ ঠান্ডা। প্রায় চার দিন স্নান হয়নি। কয়েকজন স্নান করলাম নদীর জলে। এক বন্ধু নদীটার পরিষ্কার জল খেতে চাইল। কিন্তু আমরা সবাই বারণ করলাম। পাহাড়ি জায়গায় ঘুরতে যাওয়ার আর একটা সমস্যা হল পরিশোধিত জলের অভাব। এখানে জলের কারণে পাতলা পায়খানা (ডায়রিয়া) হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পাহাড়ে যাঁরা ঘুরতে বা ট্রেকিং করতে যান, তাঁদের মধ্যে অনেকে এই 'travellers diarrhoea' তে ভোগেন। এটা প্রতিরোধ করার জন্য হাত ধুয়ে খাবার খাওয়া উচিত এবং কমসেদ্ধ ও কাঁচা খাবার না খাওয়াই ভালো। ডায়রিয়া হলে প্রথমত নুন-চিনি-লেবুর সরবত, না কমলে ciprofloxacin জাতীয় ওষুধ খেতে হবে। ঝরনা বা নদীর জল না খেয়ে যেখানে থাকছেন (যেমন হোটেল বা হাট) সেখান থেকে জল খাবেন। উপত্যকা বা নিচু উচ্চতার পাহাড়ি গ্রামের নদী উপরের উচ্চতা থেকে বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ নীচে বয়ে নিয়ে যায়।

এবারে শীত পাহাড়ে

সেবারের মতো আমরা ফিরে এসেছিলাম ঠিকই, কিন্তু আমাদের মাথায় আবার চাড়া দিয়ে উঠল সান্দাকফু যাওয়ার পরিকল্পনা। এবার সময়টা কলকাতাতেই শীতকাল, জানুয়ারি ২০১৪। খুব কম লোকজন ঠান্ডাতে যেতে রাজি হবে ভাবলাম, হলও তাই। আমরা মাত্র দু'জন পরিচিত সেই গাইডের ভরসায় তৎকাল টিকিট কেটে বেরিয়ে পড়লাম। এবারে হাতে সময় খুব কম, অল্প কয়েক দিনের মধ্যে আগের অসমাপ্ত রাস্তাটা সম্পূর্ণ করতে হবে। তাই আমরা যাত্রাপথ পাল্টালাম দার্জিলিং থেকে রিম্বিক নামে এক প্রান্তিক গ্রামে সন্ধ্যে ৫ টায় পৌঁছোলাম। টর্চের আলো আর পাতার ভিতর দিয়ে চুঁইয়ে পড়া চাঁদের আলো — এক অদ্ভুত আলো আঁধারির মধ্যে দিয়ে দুরু দুরু বুকে আমরা এগিয়ে চললাম রিম্বিক থেকে শ্রীখোলার দিকে। প্রায় ৭ কিলোমিটার অপরিচিত রাস্তা কিন্তু পরিচিত গন্তব্য। সারাদিনের ক্লান্তির পর পথ যেন শেষ হয় না। শ্রীখোলা পৌঁছে দেখি ট্রেকার হাট-এ কেয়ারটেকার নেই। ঘণ্টা দেড়েকের চেষ্টায় কোনও ক্রমে চাবি জোগাড় করে রাতটা কাটালাম। বুঝলাম যে, এই সব জায়গায় ঘুরতে এলে যা কিছুই হতে পারে। মানসিক ভাবে সমস্ত পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে হবে। পাহাড়ে যেন কোনও কিছুরই নিশ্চয়তা নেই।

কতটা পথ পেরোলে তবে?

পরদিন সকালে গাইড অনেক দেরি করে পৌঁছোল। দেরি করে শুরু করেছি, মাথায় আছে ১১০০০ ফুট এর কিছু বেশি উচ্চতার সান্দাকফুতে দিনের আলো থাকতে থাকতে পৌঁছাতে হবে। বেশ তাড়াতাড়ি ওঠার চেষ্টা

করছিলাম। অনভ্যস্ত পথে ক্লান্তও হয়ে যাচ্ছিলাম খুব তাড়াতাড়ি। এদিকে আবার গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ পড়তে শুরু করেছে। জোরে ঠান্ডা হাওয়া বইছে। কিন্তু আমাদের পৌঁছোতেই হবে। কিছুক্ষণ পরেই নাক দিয়ে জল পড়তে শুরু করল এবং হালকা মাথা ব্যথা শুরু হল। বাতাস পাতলা হয়ে এসেছে, তাই সমস্যাগুলো হচ্ছে ভেবে উপেক্ষা করলাম। কোনও ক্রমে দিনের আলো থাকতেই আমরা সান্দাকফু পৌঁছালাম। বাইরের তাপমাত্রা প্রায় ২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, শোঁ শোঁ করে বাতাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। রাতে ঘুমানোর আগে শুরু হল অসহ্য মাথাব্যথা আর শ্বাসকষ্ট। একটা প্যারাসিটামল খেয়ে চারখানা কম্বল গায়ে দিয়ে ঘুমোনোর চেষ্টা করলাম। টের পাচ্ছিলাম শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবেগ বেশ বেশি। কোনও এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পরদিন ঘণ্টা খানেক হাঁটার পরেই মাথাব্যথা, বমি-বমিভাব হতে শুরু করল। প্যারাসিটামল বের করে খেলাম। আমাদের উদ্দেশ্য প্রায় একই উচ্চতার ফালুট ট্রেকার হাট-এ পৌঁছানো।

শেষের দিকে আর পারছিলাম না আমরা। একটানা ১০ মিনিটের বেশি পথ চলতে কষ্ট হচ্ছিল, বিশ্রাম নিতে নিতে সন্ধ্যে নাগাদ ফালুট পৌঁছোলাম। পরের দিন আমরা প্রায় ৯ ঘণ্টা হেঁটে সিকিমের 'উত্তরে' পৌঁছালাম। এদিন মাথা ব্যথা, বমি-ভাব ছিল না, কিন্তু সারাক্ষণ নীচের দিকে নামতে থাকছিলাম তাই পায়ে এবং হাঁটুতে ব্যথা হচ্ছিল। কিন্তু নিজেদের শারীরিক সমস্যার কথা বলতে গিয়ে কী দেখলাম সেখানে সেটাই তো বলা হল না। ফালুট থেকে বেরনোর সময় দেখলাম আমরা যেন মেঘের ওপরে, নীচে পাহাড় তার ওপর মেঘের সমুদ্র— যেমনটা এরোপ্লেন থেকে দেখা যায়। পুরো পথটারই বেশির ভাগ সময় পায়ের নীচে শক্ত, পিচ্ছিল বরফ আর সামনে রাজকীয় ভঙ্গিমায় কাঞ্চনজঙ্ঘা। এই সিঙ্গলীলা রিজ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা সব থেকে ভালো দেখা যায়। কাঞ্চনজঙ্ঘার পুরো পর্বতশ্রেণিকে শুয়ে থাকা একটা মানুষের মতো দেখতে লাগে। নাম 'স্লিপিং বুদ্ধ'। এ ছাড়া মাউন্ট এভারেস্ট, মাকালু থেকে শুরু করে অরুণাচল প্রদেশের পর্বতশ্রেণি আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। আমাদের পরিশ্রম সার্থক। যা বলতে গিয়ে এই ঘটনার অবতারণা, তা হল 'মাউন্টেন সিক্‌নেস'।

দ্বিতীয়বার আমরা যখন সান্দাকফু গেলাম তখন আমরা এটা নিয়ে কিছুই জানতাম না। পরে বুঝেছিলাম যে, মাথাব্যথা, বমিভাব, শ্বাস কষ্টের মতো যে সমস্যাগুলো আমাদের হচ্ছিল তা 'মাউন্টেন সিক্‌নেস'-এর প্রাথমিক পর্যায়। ভারতের বিভিন্ন পাহাড়ি জায়গা (শ্রীনগর, সিমলা, শিলং, মানালি, নৈনিতাল, মুসৌরী, মুন্নার, দার্জিলিং, গ্যাংটক ইত্যাদি) যেগুলোর উচ্চতা ৫০০০ থেকে ৬৫০০ ফুটের মধ্যে, সেই জায়গাতে এই সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা কম। 'মাউন্টেন সিক্‌নেস' সাধারণত ৮০০০ ফুটের বেশি উচ্চতায় হয়, তবে কিছু ক্ষেত্রে এটা ৬৫০০ ফুটের বেশি উচ্চতায় হতে পারে। ভারতের গুলমার্গ, লেহ্, লাদাখ, না-থুলা, মানস, অমরনাথ, সান্দাকফু এই সব জায়গায় যাঁরা ঘুরতে যান বা ট্রেকিং করেন, তাঁদের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা দরকার। আমরা প্রথম দিন ৬-৭ ঘণ্টার চেষ্টায় প্রায় ৬০০০ ফুট উঠেছি, যা আহাম্মকি ছাড়া আর কিছুই নয়। তার উপর সমস্যাগুলোকে পাত্তা দিইনি। এমনটা করা উচিত হয়নি, যে কোনও সময় বিপদ ঘটতে পারত! মানুষ ভুল করে অভিজ্ঞতা অর্জন করে আর অভিজ্ঞতা অর্জন করে ঠিক কাজ করে।

আপনাকে যদি হঠাৎ করে এভারেস্ট-এর চূড়ায় নিয়ে যাওয়া হয় আপনি কয়েক মিনিটের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে যাবেন আর ১-২ ঘণ্টার মধ্যে মারা যাবেন।

কারণ কী? আপনার শরীরে অক্সিজেনের ভয়ঙ্কর রকমের অভাব তৈরি হবে এবং আপনি অক্সিজেনের অভাবে মারা যাবেন— যদিও প্রায় ৬০ জন পর্বতারোহী অক্সিজেন ছাড়াই এভারেস্ট-এর চূড়ায় পৌঁছোতে পেরেছেন। কারণ হল acclimatization (অভিযোজন/অভ্যস্তকরণ) আমরা যারা নীচু উচ্চতায় থাকি, আমাদের শরীর এখানকার পরিবেশে অভ্যস্ত। নতুন পরিবেশে (উচ্চতা, তাপমাত্রা, আবহাওয়া) শারীরিক ভাবে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার নামই acclimatization। আমাদের শরীরের অভ্যস্ত/অভিযোজিত হওয়ার ক্ষমতা আছে। খুব তাড়াতাড়ি বেশি উচ্চতায় উঠলে সেটা হয় না। এর জন্য সময় লাগে (কমপক্ষে ৬-৪৮ ঘণ্টা)।

যে পর্বতারোহীরা অক্সিজেন ছাড়াই চূড়ায় পৌঁছোতে পেরেছিলেন তাঁরা কয়েক সপ্তাহ ধরে পাহাড়ি পরিবেশে নিজেদের অভিযোজিত করেছেন। ২৬০০০ ফুট এর উপরের উচ্চতা হল মৃত্যু উপত্যকা, সেখানে এভারেস্টের উচ্চতা ২৯০০০ ফুটের বেশি।

উঠুন, তবে ভেবে চিন্তে

আপনি যদি ৮০০০ ফুটের চেয়ে উঁচু কোনও জায়গায় তাড়াতাড়ি ওঠেন এবং অভিযোজিত না হয়ে থাকেন তবে যে সমস্যাগুলো হবে তা হল 'মাউন্টেন সিকনেস' বা উচ্চতাজনিত অসুস্থতা। এর লক্ষণ প্রকাশ পেতে সময় লাগে (কমপক্ষে ৬ ঘণ্টা)। আপনি যদি কোনও উঁচু জায়গায় খুব অল্প সময়ের জন্য থাকেন বা তারপর নেমে আসেন তবে সমস্যা নাও দেখা দিতে পারে। কিন্তু উঁচু জায়গায় রাত কাটালে এই সমস্যা হতে পারে। (যতজন খুব উঁচু পাহাড়ি জায়গায় ঘুরতে বা ট্রেকিং করতে যান, তাঁদের মধ্যে ৫০ শতাংশ লোকের mountain sickness হয়)।

Mountain Sickness যে কোনও সুস্থ সবল (এমনকী খেলোয়াড়) লোকের হতে পারে, এটা শারীরিক দুর্বলতার লক্ষণ নয়। তবে যাঁরা সমুদ্র সমতলের কাছে থাকেন এবং যাঁদের আগে এই সমস্যা হয়েছে তাঁদের হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

প্রাথমিক ভাবে মাথাব্যথা, মাথাঘোরা, বমিভাব, ঝিমুনি ভাব, খিদে, ঘুম কমে যাওয়া, ক্লান্তি, দুর্বলতা ইত্যাদি হয়। এর মধ্যে কিছু সমস্যা আমাদের হয়েছিল, যা সেই সময় আমরা mountain sickness হিসেবে ভাবিনি। এই সমস্যাগুলো যদি না কমে কিংবা বাড়তে থাকে তবে উচ্চতায় আর উঠবেন না। সেক্ষেত্রে নীচে নেমে আসার ব্যবস্থা করতে হবে। এটা প্রতিরোধ করার জন্য ধীরে ধীরে উঠতে হবে এবং শরীরকে অভিযোজিত হওয়ার সময় দিতে হবে। অভিযোজনের ফলে শরীরে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা বাড়ে, এবং হৃদপিন্ড, মাংস পেশির দক্ষতা বেড়ে যায়। ৬০০০ ফুট-এর ওপরে ওঠার আগে একদিন বিশ্রাম নিতে হবে।

- মাউন্টেন সিকনেস-এর লক্ষণগুলো প্রকাশ পেলে সাবধান হতে হবে, বাড়াবাড়ি হলে নীচে নামতে হবে। (প্রাথমিক এই লক্ষণগুলি এক সময় জটিল পরিস্থিতি ধারণ করতে পারে এবং ফুসফুস ও মস্তিষ্কে জল জমতে শুরু করে। রোগীর অবস্থা দ্রুত খারাপ হতে থাকে)।
- অ্যাসিটাজোলামাইড জাতীয় ওষুধ পাহাড়ে ওঠার দুই দিন আগে থেকে শুরু করা যেতে পারে এবং সমস্যা হলে খাওয়া যেতে পারে, তবে তা অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ মতো। এই ওষুধে অ্যালার্জি হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং গর্ভবতী মহিলা বা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন এমন মায়েদের জন্য নয়।
- মাথাব্যথা হলে প্যারাসিটামল জাতীয় ব্যথা কমানোর ওষুধ খাওয়া যেতে পারে।
- জটিল শর্করাযুক্ত খাবার, জল, নুন চিনি লেবুর সরবত খেতে হবে। মদ্যপান ও ধূমপান করা যাবে না।
- ১০,০০০ ফুটের ওপরে ওঠার ক্ষেত্রে প্রতিদিন ১০০০ ফুটের বেশি ওঠা যাবে না। এর বেশি উঠলেও নীচে নেমে নিচু জায়গায় রাত কাটাতে হবে। প্রত্যেক ৩০০০ ফুট ওঠার পরে ২ রাত বিশ্রাম নিতে হবে।
- যাঁদের ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হাঁপানি, মৃগী, হার্টের রোগ আছে তাঁরা যাওয়ার আগে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। এই সব রোগে যাঁরা ওষুধ খেয়ে ভালো আছেন তাঁদের ৮০০০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত সাধারণত কোনও অসুবিধা হয় না। যাঁরা সন্তান-সম্ভবা— বিশেষজ্ঞদের মতে তাঁদের ১০০০০ ফুটের বেশি উচ্চতায় না যাওয়াই ভালো।

শেষ কথা

সবশেষে বলি, পাহাড়ে যান, ঘুরুন, ট্রেকিং করুন। চেষ্টা করবেন প্লাস্টিক ব্যবহার না করতে, যদি ব্যবহার করেন, তবে তা 'ইউজ অ্যান্ড থ্রো' মানসিকতায় এদিক ওদিক ছুঁড়ে ফেলবেন না। আমরা আমাদের সান্দাকফু ট্রেকিং রুটে অনেক জায়গায় মানুষের এই বাজে অভ্যাসের সম্মুখীন হয়েছি। এতে তো বিপদটা আমাদের ওপরেই এসে পড়বে।

যাওয়ার আগে সুচিন্তিত পরিকল্পনা করুন। যথেষ্ট সময় নিয়ে জায়গাটা সম্পর্কে জেনে নিন, তাড়াহুড়ো করবেন না। উচ্চতাজনিত অসুস্থতা সম্পর্কে জানুন, বন্ধুদের জানান। সমস্যা কমানোর জন্য সতর্ক থাকুন, প্রয়োজনমতো ওষুধ নিয়ে যান। মাউন্টেন সিকনেস (Mountain Sickness) এর মতো লক্ষণ দেখা দিলে সতর্ক থাকুন এবং প্রয়োজন মতো নেমে আসুন। নেমে আসাটা সব থেকে কার্যকর।

লেখক পরিচিতি : ডা. সূর্যেন্দুবিকাশ খাটুয়া, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষের চিকিৎসার জন্য একটা ক্লিনিকে যুক্ত।

ADVERTISEMENT

ধর্ম-জাতপাত-অযুক্তি-কর্তৃত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনার যুক্তিবাদী মননচর্চার দীর্ঘদিনের সাথী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় মুখপত্র।

কালের ভালোবাসা

দুর্বল ওম বড় হচ্ছে, জলপাইগুড়ি থাকছে। অবাধ্য শরীরটাকে নিজের চেষ্টায় আর অন্যদের সাহায্যে সাঁতার কাটতে শিখিয়ে নিচ্ছে ওম। আর বুঝছে, চেষ্টা কখনও পুরো বিফল হয় না। বিখ্যাত এক ব্রিটিশ ডাক্তার কলকাতায় এলেন সম্মেলনে, কিন্তু তিনি কোনও রোগী না দেখতে চুক্তিবদ্ধ। ওমকে নিয়ে তার বাবা ছুটে এলেন কলকাতায়, সেই ডাক্তারের কাছের মানুষ হয়ে উঠলেন নিজের চেষ্টায় ও ভাগ্যের জোরে। শেষে সেই ডাক্তার ওমকে পরীক্ষা করে জানালেন, তার সেরিব্রাল পলসি হয়নি। আর বললেন, মনের জোরে এ রোগ কিছুটা আয়ত্তে আসবে— লিখছেন **সায়মদেব মুখার্জি।**

জীবনের কোনও সময় কোনও শিশু যদি আঘাতের পর আঘাত পায়, তখন সে বুঝতে পারে না, এটা কালের একটা খেলা। আর যখন তার সঙ্গে থাকা বড়রাও উদ্দেশ্যবিহীনভাবে চেষ্টা করতে থাকেন যাতে কোনও মহাশক্তিকে তুষ্ট করা যায়, যাতে শান্তি আসে সংসারে, তখন সেই শিশুর জীবনও উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে যায়। আস্তে আস্তে ওম শারীরিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে। কিন্তু তার কারণ কেউই বুঝতে পারছে না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যখন তার বাবার বদলি হল জলপাইগুড়িতে, খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল ওম। এই বদলির সময় ওম স্কুলে যেতে পারত না। কারণ, কিন্ডারগার্টেন স্কুল থেকে চলে আসার পর সে 'স্প্যাস্টিক্স সোসাইটি অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ায় দ্বিতীয় বার ভর্তি হতে পারেনি। সেখানে ভর্তি হওয়া খুব জরুরি ছিল। কিন্তু কালের খেলা কখনও কেউ বুঝতে পারে না। সেই সময় জীবন থেকে ওম কী শিক্ষা পাচ্ছিল, একবার দেখে নেওয়া যাক।

আশির দশকের দ্বিতীয় অর্ধে, ওমের পরিবার যখন জলপাইগুড়ির মতো সুন্দর শহরে গিয়ে পড়ল, সেখানে কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো চূড়া থেকে নেমে আসা সুন্দর হাওয়ার সঙ্গে উপস্থিত ছিল ওমের জেঠু, জ্যাঠতুতো দাদা-দিদি, এবং মায়ের মতো জেঠিমা। সঙ্গে ছিল একটা স্পেশাল স্কুল। যাতে ওম ভর্তি হয়ে একটুখানি নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো বাঁচার আলো পায়। কলকাতায় থাকার সময়ে ওমদের বাড়িতে টেলিভিশন নামক বস্তুটা ছিল না। অর্থনৈতিক ভাবে সাবলীল অবস্থা না থাকার জন্য ডাক্তারবাবুর বাড়িতে সেই সময় দরকারি অনেক কিছুই ছিল না।

জীবনে প্রথম প্র্যাকটিসিং পোস্ট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভাবান শল্য চিকিৎসক তাঁর প্রতিভা দেখানো এবং সাংসারিক চাহিদা মেটানোর মতো উপার্জন শুরু করলেন। তার প্রথম ফল হিসেবে ঘরে এল সেই বস্তুটা— টেলিভিশন। ওম জানতে পারল বাইরের জগৎ সম্পর্কে। এর সঙ্গে সে যখন স্কুলে যেতে শুরু করল, তার জীবনে ঢুকতে শুরু করল শিক্ষার আলো। শিক্ষার মাধ্যমেই ওম বুঝতে পারে, জীবনটা শেষ করে দেওয়ার থেকে বাঁচাটা অনেক সোজা। একজন ফিজিওথেরাপিস্ট এবং কয়েক জন মা মিলে ভোরবেলা ঠান্ডার সময় যাওয়া হত সাঁতারের ক্লাবে। একটা ছোট্ট পুকুরে প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন ছোট ছোট কিছু ছেলেমেয়ে জলের তলায় এক্সারসাইজ করত। জলের তলায় ওজন কমে যাওয়ায় মাংসপেশি অনেক সাবলীল ভাবে নাড়াচাড়া করানো যেত। সেখানে ওমের খুব ভালবাসার একজন মানুষ থাকতেন— ফিজিওথেরাপিস্ট রজত। রজত ওমকে নিয়ে অনেকটা সময় কাটাতেন। এক দিন সূর্যের কিরণ সময়ের ঈশারায় অনেক উপরে উঠে গিয়েছে, কিন্তু তখনও সেই পুকুরের মধ্যে রজত ওমকে খেলিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ ওমকে নিয়ে পুকুরের মাঝখানে পৌঁছে গেলেন রজত। ৮ বছরের ওমকে তিনি বললেন, — 'তোকে এবার ছেড়ে দেব, দেখি তুই নিজে জলের উপরে উঠে আসতে পারিস কি না'। তিনি হয়তো ওমের চেষ্টাটুকু দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রথমবার ওমের মাংসপেশি জলের তলায় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অসম্ভব শক্ত হয়ে গেল। হঠাৎ সে বুঝতে পারল, তার পিঠ জলের তলায় একদম মাটিতে গিয়ে ঠেকেছে। সে নিজের মাথামুখ দিয়ে জল ঢোকা বন্ধ করল। যখন একদম শেষ অবস্থা, তখন আন্দাজমতো রজত জলের তলায় গিয়ে ওমকে তুলে আনলেন।

সেই দিন একবারের সেই এক্সপেরিমেন্টের খেসারত ওমকে দিতে হল, বমি করে। এরপর আরও পরপর পাঁচ দিন একই ভাবে চাণক্যের মতো শক্ত হাতে রজত এবং ওমের মা জলের তলায় ছেড়ে দিতেন ৮ বছরের ছেলেটাকে। ছ' দিনের দিন রজত যখন ওমকে নিয়ে আবার পুকুরের মাঝখানে নিয়ে গেলেন এবং একই ভাবে তলিয়ে যাওয়ার জন্য ওমকে ছেড়ে দিলেন, সেদিন অজান্তে ওম অনেক বেশি শান্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই কারণেই ওমের মাংসপেশি অনেক বেশি আয়ত্তে ছিল। রজত ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওম নিঃশ্বাস নেওয়ার বন্ধ করে চোখটাও বন্ধ করে ফেলল। জলের তলায় কিছুটা যাওয়ার পর সে হঠাৎ বুঝতে পারল, এই দিন সে আর তলিয়ে যাবে না। আস্তে আস্তে হাত পা না নেড়ে ওম যখন তার দেহটাকে ভাসিয়ে ওঠাতে পারল, তখনও সে নিঃশ্বাস ছাড়েনি। হয়তো চোখ খুললে সে দেখতে পেত, রজতদা তার দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের কোণে হাসি নিয়ে এসেছেন।

এই প্রথম ওম বুঝতে পারল, চেষ্টা সব সময় ফল দেয়। ইতিমধ্যে এক দিন ওমের বাবা বাড়ি ফিরে বললেন, 'স্প্যাসটিকস সোসাইটি অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া' থেকে চিঠি এসেছে। 'ব্রিটিশ ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথ'-এর ডিরেক্টর ডা. হল্ট কলকাতায় আসবেন একটা সম্মেলনে। তাঁদেরও সেই সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। ওমের বাবা এ-ও জানালেন, মিসেস কউল চিঠিতে লিখেছেন, ডা. হল্ট কোনও রোগীকে পরীক্ষা করবেন না বা দেখবেন না বলে ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। তবে চিঠির শেষ মিসেস কউল ঠাট্টার ছলে এ-ও লিখেছেন যে, 'ডক্টর, আমি জানি যে তুমি ওমকে একেবারে ডা. হল্টের সামনে নিয়ে গিয়ে ফেলবে'।

প্রস্তুতি শুরু হল কলকাতায় আসার। ওমরা উত্তর কলকাতার আদি

বাড়িতে না উঠে নিউ আলিপুরে ওমের জেঠুর বন্ধুর বাড়ি উঠল। কারণ, সেখান থেকে তারাতলায় স্প্যাসটিকস সোসাইটি কাছে। দু'দিনের সম্মেলনে প্রথম দিনের প্রথম ঘণ্টাতেই ডা. কউ ওমের বাবার সঙ্গে ডা. হল্টের আলাপ করিয়ে দিলেন। কথায় কথায় জানতে চাওয়া হল, ডা. হল্টের পছন্দ কী?

দুপুরের দিকে দেখা গেল, ওমের বাবা উধাও। তিনি তখন চলে গিয়েছেন নিউ মার্কেটে একটা ফুলের দোকানে। দোকানদারকে বলা হল, তিনি যখনই পারেন, যেন লোক পাঠিয়ে হোটেল হিন্দুস্থানের ৬১২ নম্বর রুমটার সব ফুল বদলে দেন এবং লোক পাঠিয়ে ওই রুমটা ফুলে সাজিয়ে দেন। এরপর থেকে যখনই ডা. হল্ট হোটেলের বাইরে যেতেন, ওমের বাবার কাছে এবং ওই দোকানে ফোন যেত। বলে রাখা দরকার, ৮০-র দশকে ওই সময়ে ভারতের কোনও মানুষ হয়তো মোবাইলের নামই শোনেননি। ওমের বাবা যেখানে যেখানে থাকতে পারেন, তেমন তিনটে সম্ভাব্য বাড়ির ফোন নম্বর হোটেলের ম্যানেজারের কাছে দেওয়া ছিল। এই খেলায় বিধাতা পুরুষও যেন ওমের সঙ্গে ছিলেন।

তিন দিন পর ডা. হল্ট ধূম জ্বরে পড়লেন। তখন সাহেবের বিশ্বাসযোগ্য চেনাশুনো ডাক্তার বলতে ওমের বাবা। ডা. হল্টের স্ত্রী ওমের বাবাকে অনুরোধ করেন, যেন তাঁদের টিকিট বদলে ফিরে যাওয়ার দিন এগিয়ে আনা হয়। কিন্তু তা সম্ভব না হওয়ার ওমের বাবার চিকিৎসায় থাকতে হল ডা. হল্টকে। বিলেত উড়ে যাওয়ার আগের দিন ডা. হল্ট এক সময় প্রশ্ন করলেন, ''ডক্টর গত কয়েক দিন ধরে তুমি শুধু আমার চিকিৎসকই নও, আমার বিশ্বাসভাজন মানুষ হয়ে উঠেছো। আমার নিজের অভিজ্ঞতা বলে, তুমি আমাকে কিছু বলতে চাও। কিন্তু ভদ্রতাবশত তুমি বলে উঠতে পারছ না।'' এরপর তিনি এক দৃষ্টিতে ওমের বাবার দিকে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ এবং জানতে চান। ওমের বাবা বলা শুরু করেন, ''আমি মানি না, আমার ছেলের সেরিব্রাল পলসি আছে। আমি সুদূর জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতায় এসেছিলাম, শুধুমাত্র তোমাকে একবার আমার ছেলেকে দেখাব বলে। কিন্তু যত তোমার সঙ্গে মিশেছি, তত তোমার ভালবাসার মানুষ হয়ে উঠেছি। এখন তোমার জ্বর হয়েছে, তুমি আমাকে ডেকেছো তোমার চিকিৎসার জন্য। মনের দোটানায় ছেলেকে নিচে গাড়িতেই বসিয়ে রেখে এসেছি। তুমি ক্লান্ত, এখন কিছুক্ষণ আরাম কর।'' সেই সাহেব বাঙালি ডাক্তারের কাঁধে হাত রেখে বলেন— ''ছেলেকে নিয়ে এসো। আমি দেখব তোমার ছেলেকে।''

৯ বছরের ছেলেকে কোলে করে উঠিয়ে আনলেন বাবা। ঘরে ঢোকার সময় ওম ফুলের গন্ধ পায়, মনে হয় কোনও মন্দিরে চলে এল। প্রথমে ওমকে সোফার উপর বসিয়ে চোখের দৃষ্টি এবং ছোটখাটো মাংসপেশির উপর ওমের দখল কতটা, তা পরীক্ষা করলেন ডা. হল্ট। তারপর তাকে সোফায় শুইয়ে ডা. হল্ট একটা আপেল হাতে তুলে নিলেন টেবিল থেকে। ছোট থেকেই ইংরেজি বুঝত বলে ওমকে বাবা-মায়ের বলে দিতে হল না যে কী করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রথম ওম দেখতে পেল সেই সুঠাম সাহেবকে। চওড়া কব্জি, সুন্দর লম্বা আঙুল প্রথমে নজর এল ওমের। তিনি ওমকে বলেন, 'আমি যেদিকে যেদিকে আপেলটাকে নিয়ে যাচ্ছি, তুমি হাত উঠিয়ে সেই দিকগুলোতে যাওয়ার চেষ্টা কর'। আরও একটু হেসে বললেন, ''না যেতে পারলেও চিন্তার কিছু নেই''। দেড় ঘণ্টার এই পরীক্ষার পর ডা. হল্ট বাবার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন আবার, ''ডা. তোমার কথাই ঠিক। তোমার ছেলের সেরিব্রাল পলসি নেই। তুমি ওর জীবনের যা ইতিহাস বললে এবং আমি যা পরীক্ষা করলাম, তাতে আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত।'' ওমের বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, ''তা হলে আমার ছেলের অসুখটা কী''? ডা. হল্ট বলেন— ''এইটুকুই বলতে পারি যে ওর সেরিব্রাল পলসি নেই। আর যা বলতে পারি, তুমি যেটা ডাক্তারি পড়ার সময়েও পড়েছো যে আমাদের শরীরে অনেক এনজাইম আছে। কোনও একটা এনজাইম হয়তো তোমার ছেলের শরীরে তৈরি হয় না।'' ওমের বাবা বলেন, ''তুমি আমার ছেলেকে গিনিপিগের মতো ইউজ করতে পারো না? আমি আমার মতো চাকরি খুঁজে নেব বিলেতে।'' ডা. হল্ট শান্ত ভাবে বললেন, ''ডক্টর, তোমার এই দেশে অনেক মহাপুরুষ এসেছেন। তুমি এই দেশেই ছেলেকে রাখো। অন্য কেউ হলে কথাটা বলতাম না, তুমি বলেই বলছি। ওর উপরে গবেষণা করলে হয়তো ওর রোগটা বার করতে পারব, কিন্তু ট্রিটমেন্ট বার করতে পারব না। যেমন ভাবে তুমি তোমার ছেলেকে বড় করছ, তেমন করেই করে যাও। তোমার ছেলেকে মনঃসংযোগ শেখাও, দেখবে এতে ভাল হবে।'' এক জন এত বড় বৈজ্ঞানিকের মুখ থেকে এ কথা শোনার পরে অবাক হওয়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। কিন্তু বিজ্ঞান যে কোনও কোনও জায়গায় উত্তর দিতে পারে না, তা আবার প্রমাণ হল।

লেখক পরিচিতি : সায়মদেব মুখার্জি, রেডিও জকি।

ADVERTISEMENT

সাধারণ অসুখবিসুখ ও ওষুধবিষুধ সম্বন্ধে জানতে পড়ুন—

ওষুধবিষুধ ও চিকিৎসার সরঞ্জাম

স্বাস্থ্যকর্মীদের নিত্যসঙ্গী হাতিয়ার

সংগ্রহ করবার ঠিকানা :
কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট মেডিসিনাল ইউনিট
৮৬সি, ডা. সুরেশ সরকার রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৪ ফোন : ২২৬৫-২৩৬৩

এবিপি আনন্দের অ্যাঙ্কর টেলিভিশন সাংবাদিক সন্দীপ্তা চট্টোপাধ্যায়
চলে গিয়েছেন ২০১২ সালের ২ ডিসেম্বর, মাত্র ৩৪ বছর বয়সে।

সন্দীপ্তা অন্যের জন্য ভাবতে এবং করতে জানতেন।
তাঁকে মনে রেখে মেয়েদের স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর এক উদ্যোগ

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

মেয়েদের স্বাস্থ্য–ভুবন

মাথা থেকে পায়ে, সব রোগ বিদায়!

সারা শরীরের যে কোনও রোগের সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত নতুন ওয়েস্টব্যাঙ্ক হেলথ্ অ্যান্ড ওয়েলনেস ইন্সটিটিউট-এ 'মেডিসিন' বিভাগে। রয়েছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দল।

মেডিসিন

ড. সতীশ গুপ্ত (এমডি, এমআরসিপি)
ড. মণিময় ঘোষ (এমডি, এফআরসিপি)
ড. নীলাঞ্জন পত্রনবিশ (এমডি)
ড. রাজর্ষি সেনগুপ্ত (এমডি)
ড. সঞ্জয় কে শাহ (এমডি, এমআরসিপি)

westbank
HEALTH & WELLNESS INSTITUTE

বিশ্বমানের পরিকাঠামো। অত্যাধুনিক চিকিৎসা। দ্বিতীয় হুগলি সেতু ও হাওড়ার আন্দুল রোডের সংযোগস্থলে অবস্থিত এই নতুন হসপিটালে একই ছাদের নীচে পাবেন সবরকম সুচিকিৎসার সুযোগ।

120/1, আন্দুল রোড, হাওড়া-711103 | ফোন: (033) 7120 5050, 2668 2668
ই-মেল: westbank.hospital@gmail.com | ওয়েব: www.westbankhospital.in

innercircleindia.com

নবজাতকের খাদ্য খাবার

পঞ্চম পাঠ

মায়ের খাবার ও বুকের দুধ

মায়ের দুধই শিশুর সেরা খাবার। সেই সেরা খাবার পেতে গেলে স্তন্যদাত্রী মায়ের খাদ্য খাবারের দিকে নজর দিতে হবে। শিশুকে খাওয়াতে গিয়ে মায়ের স্বাস্থ্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল, এমনটা যেন না হয়। মায়ের খাদ্য নিয়ে লিখছেন **ডা. স্বপন বিশ্বাস**।

আমরা আগের লেখাগুলোয় আলোচনা করেছি, কী করে বুকের দুধ তৈরি হয়, বুকের দুধে শিশুর কী উপকার হয়, মায়ের কী উপকার হয়। আমরা চাই, হ্যাঁ, সত্যিই চাই, প্রতিটা শিশু মায়ের দুধ খেয়ে বড়ো হয়ে উঠুক, তার প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ুক, সে সুস্থ সবল হয়ে বেঁচে থাকুক, জীবনের শুরুতে জীবনদায়িনী তার মা তাকে বুকের দুধ খাইয়ে বড়ো করে তুলুক। মায়ের স্তনই পৃথিবীর সবচেয়ে দামি কারখানা, যেখানে নবজাতকের খাদ্য উৎপাদন হয়। যে কোনও ডিগ্রিধারী ইঞ্জিনিয়ার যতই চেষ্টা করুন না কেন, তিনি এই কারখানা তৈরিও করতে পারবেন না, একে সারাতেও পারবেন না। মা-ই একে তৈরি করেন, তাকে বহন করে নিয়ে চলেন, তার পরিচর্যা করেন। মা-ই তাঁর খাদ্যের মাধ্যমে এর কাঁচামাল সরবরাহ করেন, দুধ তৈরি করেন, তাঁর শিশুকে সরবরাহ করেন প্রয়োজন মতো। মা-ই এর হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার, মা-ই এর ইঞ্জিনিয়ার, মায়ের মস্তিষ্কই এর সিপিইউ। এবং একথাও সত্যি যে, মা যদি একবেলা না খান তবুও বুকের দুধের কোনও হেরফের হবে না, তবু বরাবরের জন্যে এই কারখানায় উৎপাদন ঠিক রাখতে গেলে, তার সাপ্লাই ঠিক রাখতে গেলে মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখতে হবে। মাকে ঠিকমতো খাবার খেয়ে এই কারখানার কাঁচামালের সরবরাহ ঠিক রাখতে হবে, তবেই সঠিক গুণ-সম্পন্ন সঠিক পরিমাণের বুকের দুধ তৈরি হবে। এবার আমরা আলোচনা করব, মায়ের খাদ্য-খাবার নিয়ে। মায়ের কী খাওয়া উচিত, কতটা খাওয়া উচিত, কী খাওয়া উচিত নয়।

প্রায় প্রতিটা নতুন মায়েরই দুশ্চিন্তা তার নিজের খাবার নিয়ে এবং শিশু কী খাবে তাই নিয়ে। আর বুকের দুধ যথেষ্ট হয় না বলেও অনেক মায়ের দুশ্চিন্তা। কিন্তু ডাক্তারি শাস্ত্র বলে, কোনও মায়েরই বুকের দুধ হবে না, এমন নয়। বরং সঠিক ভাবে শিশুকে প্রথম থেকে বুকের দুধ দিলে, মায়েরা নিজেরা ঠিক মতো খাদ্য-খাবার খেলে, দুশ্চিন্তা না করলে অবশ্যই বুকে দুধ হবে।

এখানে একটা কথা মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। আমরা শিশুকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি এনে যেমন নরম তোশকের উপর শুইয়ে রাখি, সব সময় নজর রাখি তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভালো-মন্দের দিকে, বিপদ-আপদে আগলে রাখি তাকে, তেমনি পরিবারের অন্য সকলেরও মাকে আগলে রাখতে হবে। মায়ের ভালোমন্দ, খাদ্য-খাবারের উপর নজর দিতে হবে। অপুষ্ট গাছে যেমন পুষ্ট ফল হয় না, তেমনি অসুস্থ বা অপুষ্ট মায়ের সন্তানও সবল সতেজ হবে না। মা যেমন শিশুকে দেখবেন, তেমনি মাকে দেখার দায়িত্ব পরিবারের, সমাজের এবং রাষ্ট্রেরও। শিশুর থেকে মাকে কোনও অংশে কম যত্ন করলে হবে না। কোনও খাবার মায়ের সহ্য না হলে মায়ের হজম হবে না, গ্যাস হবে, ঘুম হবে না, এবং তার পরোক্ষ প্রভাব পড়বে তার শিশুর উপর। তারও পেটে ব্যথা হতে পারে, রাতে সে কাঁদতে পারে। মায়ের সর্দি হলে তাঁর শিশুর সর্দি হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই প্রথম দিকে মাকেও থাকতে হবে খুব সতর্ক হয়ে, যাতে তাঁর শরীর সুস্থ থাকে, পুষ্টি বা খাদ্য-খাবারও ঠিক থাকে।

মায়ের যে সব খাবার বিশেষ দরকার

আবার সেই হিসাবের পালা। আগে আমরা খাদ্য-খাবার নিয়ে আলোচনায় দেখেছি, খাদ্যের শক্তিগুণ হল ক্যালরি। এই ক্যালরি সরবরাহ করে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট জাতীয় খাবার। আর ভিটামিন আমাদের শরীরকে রক্ষা করে। তবে বিস্তারিত হিসাব পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারে, তাই যে সব খাদ্যের উপর বিশেষ ভাবে নজর রাখতে হবে, তাই নিয়েই সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। তবে খুব সংক্ষেপে বললে, এই সময়ে মাকে অনেক তরকারি, সবুজ শাক-সবজি ও ফল খেতে হবে।

১. **ক্যালরি :** স্বাভাবিক অবস্থায় যে পরিমাণ ক্যালরির দরকার হয়, বুকের দুধ খাওয়ালে তার চেয়ে অতিরিক্ত ৫০০ ক্যালরি বেশি দরকার হয়। মোটামুটি ২০০০-২৫০০ ক্যালরির খাদ্য মাকে প্রতিদিন খেতে হবে। তবে অতসব বিচার না করে খিদে পেলেই মা খাবে, এ ভাবে চললেও হয়। আগের আলোচনায় আমরা বলেছি, মায়ের গর্ভাবস্থায় ওজন বাড়ে। এই ওজন কমানো দরকার। কিন্তু শিশু জন্মের প্রথম দু'মাস খাবার কমিয়ে বা ক্যালরি কমিয়ে ওজন কমানোর দরকার নেই। দু'মাস পর থেকে ধীরে ধীরে ১ বছরের মধ্যে ওজন কমানোর পরিকল্পনা করতে হবে।

২. **প্রোটিন :** বুকের দুধ খাওয়ানো মায়েদের বেশি প্রোটিন লাগে। প্রোটিন যেমন দুধের সঙ্গে ক্ষরিত হয়ে শিশুর শরীরের গঠনে এবং মেরামতির কাজে লাগে, তেমনি মায়েরও কাজে লাগে। প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাদের স্বাভাবিক অবস্থায় দিনে প্রোটিন লাগে ৫০ গ্রাম, গর্ভবতী অবস্থায় দৈনিক ৬৫ গ্রাম আর বুকের দুধ খাওয়ালে লাগে ৭৫ গ্রাম। স্বাভাবিকের চেয়ে ২৫ গ্রাম বেশি।

যে সব খাবারে বেশি প্রোটিন রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য — মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, বিন বা সিম জাতীয় খাদ্য, সয়াবিন ও বাদাম। রুটি ও পাস্তার মধ্যেও যথেষ্ট প্রোটিন থাকে।

৩. **ফ্যাট :** প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলাদের স্বাভাবিক অবস্থায় দিনে ফ্যাট লাগে ২০ গ্রাম, গর্ভবতী অবস্থায় দৈনিক ৩০ গ্রাম আর বুকের দুধ খাওয়ালে লাগে ৪৫ গ্রাম। দৈনিক প্রয়োজনীয় ক্যালরির ১৫-২০ শতাংশ এই ফ্যাট বা চর্বি জাতীয় খাবার থেকে আসা উচিত। যে সব খাবারে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড আছে, মায়ের সেই সব খাবার বেশি খাওয়া উচিত। মাছের তেল, কিছু সামুদ্রিক মাছ, বাদাম, অ্যামন্ড , আখরোট, ইত্যাদিতে এই ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড বেশি থাকে।

৪. **ফলিক অ্যাসিড বা ফোলেট :** এটা একটা ভিটামিন। শিশুর ও মায়ের জন্য দরকার হয়। প্রতিদিন দরকার ৪৫০-৫০০ মাইক্রোগ্রাম। শাকসবজি, বিন, বাদাম, ইস্ট ইত্যাদিতে ফোলেট থাকে।

৫. **আয়োডিন :** আয়োডিন থাইরয়েড হরমোন তৈরির জন্য দরকার হয়। এই হরমোন আমাদের শরীরের পুষ্টি, বিকাশ ও বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত। বুকের দুধ খাওয়ানো মায়েদের দৈনিক ১৯০ মাইক্রোগ্রাম আয়োডিনের দরকার। সামুদ্রিক খাদ্যবস্তুতে, দুধে ও সবজিতে আয়োডিন থাকে।

৬. **জিঙ্ক :** একটা ধাতব পদার্থ। বিভিন্ন উৎসেচকের তৈরির জন্য ও কাজের জন্য জিঙ্কের দরকার। মায়েদের প্রতিদিন ১০-১২ মিলিগ্রাম জিঙ্কের দরকার। দানাশস্য, মাংস, দুধ, সামুদ্রিক খাদ্য, বাদাম ইত্যাদির মধ্যে জিঙ্ক থাকে।

৭. **ভিটামিন 'এ' :** ভিটামিন 'এ' শরীরের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, চোখের গঠন ঠিক করে, প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। মায়েদের দৈনিক দরকার ৮০০-১১০০ মাইক্রোগ্রাম। দুধ, ঘি, চিজ, তেলের মাছ, হলুদ-কমলা রঙের তরকারি, গাজর, কুমড়ো, আম ও অন্যান্য তরিতরকারিতে ভিটামিন 'এ' বেশি পাওয়া যায়।

৮. **ভিটামিন 'বি৬' :** শরীরে প্রোটিনের বিপাক ও লোহিত রক্তকণিকা সৃষ্টিতে ভিটামিন 'বি৬' এর দরকার হয়। দুধ খাওয়ানো মায়েদের দৈনিক ১.৭-২.০ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'বি৬'-এর দরকার হয়। মাংস, মেটে, মাছ, দানাশস্য ও সিম জাতীয় খাদ্যে ভিটামিন 'বি৬' বেশি পাওয়া যায়।

৯. **জল :** শরীরের স্বাভাবিক অবস্থায় যে জলের দরকার, বুকের দুধ খাওয়ালে তার চেয়ে কমপক্ষে ৭০০ মিলিলিটার জল বেশি দরকার হয়। সারাদিনে কমপক্ষে ৮-১২ গ্লাস জল খাওয়া দরকার। বেশি খেলে আরও ভালো। বিশুদ্ধ জল বা দুধ, ফলের রস ইত্যাদি পানীয় হিসাবে এই জল খাওয়া যেতে পারে।

১০. **ফাইবার জাতীয় খাবার :** যে সব খাদ্যে ডায়েটারি ফাইবার (তন্তুজাতীয় দ্রব্য) আছে, মায়ের সেই সব খাবার যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়া উচিত। ফাইবার এক ধরনের কার্বোহাইড্রেট খাবার, যা বিভিন্ন সবজিতে থাকে। মানুষের পরিপাকতন্ত্র এই খাবার হজম করতে পারে না, ফলে ফাইবার মলের সঙ্গে নির্গত হয়। তাই ফাইবার পায়খানা পরিষ্কার করে এবং মায়ের কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। ফল, শাকসবজি, বিন, ডাল, আটার রুটি ইত্যাদিতে যথেষ্ট পরিমাণ ফাইবার থাকে।

১১. **খাদ্যাভ্যাস বদল :** মা এক সঙ্গে খুব বেশি করে দিনে দু'তিনবার না খেয়ে, বারবার২ -৩ঘ ণ্টাঅ ন্তরঅ ল্প পরিমাণখ াবারে খলেভ ালো।এ তে মায়ের বেশি খাবার প্রবণতা কমে, সারাদিন শরীরের বিপাক ক্রিয়া সচল থাকে—যা মায়ের এবং শিশুর পক্ষে ভালো। কাজেই প্রয়োজনে মাকে তার খাদ্যাভ্যাসে বদল আনতে হবে।

যে যে খাবারের বেশি প্রয়োজন হয়, তার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা :

খাদ্য	স্বাভাবিক অবস্থায় লাগে	বুকের দুধ খাওয়ালে লাগে
ক্যালরি	২০০০ কিলোক্যালরি	২৫০০ কিলোক্যালরি
প্রোটিন	৫০ গ্রাম	৭৫ গ্রাম
ফ্যাট	২০ গ্রাম	৪৫ গ্রাম
ক্যালসিয়াম	৪০০ মিলিগ্রাম	১০০০ মিলিগ্রাম
ভিটামিন 'এ' (রেটিনল)	৬০০ মাইক্রোগ্রাম	৯৫০ মাইক্রোগ্রাম
ভিটামিন 'এ' (বিটা ক্যারোটিন)	২৪০০ মাইক্রোগ্রাম	৩৮০০ মাইক্রোগ্রাম
আয়রন	১৮-২১ মিলিগ্রাম	১৮-২১ মিলিগ্রাম
ভিটামিন-থিয়ামিন (বি১)	১.১ মিলিগ্রাম	অতিরিক্ত ০.৩ মিলিগ্রাম
ভিটামিন-নিকোটিনিক অ্যাসিড	১৪ মিলিগ্রাম	অতিরিক্ত ৪ মিলিগ্রাম
ভিটামিন-পাইরিডক্সিন (বি৬)	২ মিলিগ্রাম	২.৫ মিলিগ্রাম
ভিটামিন 'সি'	৪০ মিলিগ্রাম	৮০ মিলিগ্রাম
ভিটামিন-ফোলিক অ্যাসিড	১০০ মিলিগ্রাম	১৫০ মিলিগ্রাম
ভিটামিন বি ১২	১ মাইক্রোগ্রাম	১.৫ মাইক্রোগ্রাম

মায়ের যে সব খাবার বুকের দুধের জোগান বাড়ায়

কিছু কিছু খাবার আছে, যা বুকের দুধের জোগান বাড়িয়ে দেয়। এর বেশির ভাগই বিভিন্ন গবেষণায় বা পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু কোন খাবারের কী রাসায়নিক উপাদান শরীরের কোন অংশে কাজ করে এবং কী ভাবে দুধ বাড়ায়, সে তথ্য সব জানা নেই। যে সব ভারতীয় খাদ্য দুধের জোগান বাড়ায় বলে মনে করা হয়, সেগুলো হল যব, ওটমিল, বাদামি চাল, পেঁপে, লাউ ইত্যাদি। এ ছাড়া, মেথি, মৌরি, জিরা, তিল, তুলসী ইত্যাদি মসলা জাতীয় খাদ্যেরও এই গুণ আছে বলে বলা হয়। এগুলো নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা এখনও হয়নি। এগুলো ছাড়াও মায়ের ও শিশুর যথেষ্ট পুষ্টি লাভের জন্য বিট, গাজর, মিষ্টি আলু, পালংশাক, মুসুর ডাল, অ্যাসপারাগাস, অ্যামন্ড, অ্যাপ্রিকট, তরমুজ ও খরমুজ উপকারী ভালো খাদ্য।

মা যে খাবার খেলে শিশুর অসুবিধা হতে পারে

১. কফি, চকোলেট এবং কোলা জাতীয় খাবার : কফি বা চকোলেটে ক্যাফিন নামক পদার্থ থাকে। মা বেশি পরিমাণ কফি খেলে বা ক্যাফিন জাতীয় খাদ্য খেলে এই ক্যাফিন মায়ের রক্তে মিশে যায়। রক্তে যে পরিমাণ ক্যাফিন মেশে তার ১ শতাংশ বুকের দুধের সঙ্গে বের হয়। চার মাসের কম বয়স্ক শিশু এই ক্যাফিন পরিপাক করতে পারে না, ধীরে ধীরে তাদের শরীরে ক্যাফিন জমা হয়। এর ফলে শিশু ঘুমোতে চায় না, সব সময় চঞ্চল থাকে এবং খিটখিটে হয়ে যায়।

তবে অল্প পরিমাণ খেলে তেমন অসুবিধা হয় না। দৈনিক ৩০০ মিলিগ্রাম ক্যাফিন (৩ কাপ কফি বা ৬ কাপ চা) খাওয়া যেতে পারে। তার বেশি নয়। কিন্তু এই পরিমাণে খেলেও যদি শিশুর উপরোক্ত লক্ষণ দেখা যায়, তবে ক্যাফিন জাতীয় খাবার খাওয়া আরও কমাতে হবে।

বিভিন্ন খাদ্য বস্তুতে যে পরিমাণ ক্যাফিন থাকে

২০০ মিলি ইনস্ট্যান্ট কফি : ২৭-১৭৩ মিলিগ্রাম ক্যাফিন থাকে
২০ মিলি ইনস্ট্যান্ট চা : ৩০ মিলিগ্রাম ক্যাফিন থাকে
৩৩০ মিলি কোলা : ৩০-৫৬ মিলিগ্রাম ক্যাফিন থাকে
৫০ গ্রাম চকোলেট : ১০-৫০ মিলিগ্রাম ক্যাফিন থাকে

২. মদ বা অ্যালকোহল (alcohol) : মদ বা মাদক দ্রব্য খেলে সেই মাদক রক্তে মেশে। যে পরিমাণ মাদক রক্তে প্রবেশ করে, মায়ের বুকের দুধেও সেই পরিমাণে মাদক নিঃসৃত হয়। অল্প পরিমাণ মদ কোনও ক্ষতি করে না, কিন্তু বেশি পরিমাণ মদ শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কোনও মায়েরই তার শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো উচিত নয়। এছাড়া অধিক মদ্যপান মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে, শিশুর পরিচর্যার ব্যাঘাত ঘটায়, মায়ের পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটায়। এই জন্য স্তনদায়িনী মাকে অ্যালকোহল জাতীয় মাদক দ্রব্য থেকে দূরে থাকতে হবে।

৩. বেশি মশলা জাতীয় খাবার (spicy foods) : শিশুর সমস্যা তৈরি করতে পারে। পেটে ব্যথা, খিটখিটে ভাব আসতে পারে। আবার কোনও কোনও শিশুর কিছু হয় না। তবে মায়ের নিজের ও শিশুর জন্য বেশি মশলা জাতীয় খাবার না খাওয়া ভালো।

৪. ব্রকোলি (broccoli) : ফুলকপির মতো কিন্তু সবুজ রঙের। ফুলকপি ও ব্রকোলি শিশুর পেটে গ্যাস তৈরি করতে পারে যা পেটে ব্যথার কারণ হতে পারে। মাকে খেয়াল রাখতে হবে তিনি কী খাবার খাচ্ছেন, তার সঙ্গে শিশুর অস্থিরতা, পেটে গ্যাস, বা রাত্রে কান্নার সম্পর্ক আছে কি না। সে রকম মনে হলে মাকে সেই খাবার বন্ধ করতে হবে।

৫. টক বা লেবু জাতীয় খাবার বা ফলের রস (citrus fruit) : শিশুর অপরিণত পরিপাক তন্ত্রে এই রস হজমে সমস্যা তৈরি করে, ফলে শিশু সব সময় খিটখিটে হয়ে থাকে, মুখ দিয়ে বেশি লালা বের করে। এমনকী, কোনও কোনও শিশুর মলদ্বারের চারপাশে র‍্যাস বা লাল হয়ে যেতে পারে। এ সব হলে এই খাবার বন্ধ করতে হবে।

৬. রসুন (garlic) : মা যদি রসুন খায়, সেই গন্ধ বুকের দুধের মধ্যে ২ ঘণ্টা পর্যন্ত থাকতে পারে। শিশুর কাছে এই গন্ধ ভালো নাও লাগতে পারে। শিশু মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে বা উত্তেজিত হতে পারে। এ সব নির্ভর করছে শিশুর উপর। বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে এই পছন্দ বিভিন্ন হতে পারে। ইটালিতে রসুনের প্রচলন বেশি, সেখানে মায়েদের ৪ মাস পর্যন্ত রসুন না খেতে বা কম খেতে বলা হয়। কিন্তু ভারতে মায়েদের রসুন বেশি খেতে বলা হয়, মনে করা হয়, এতে বুকের দুধের পরিমাণ বাড়ে এবং শিশুও নানারকম খাদ্যবস্তুর গন্ধের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। ফলে পরবর্তী সময়ে শিশু বিভিন্ন রকমের খাবার সহজে খায়। কিন্তু শিশু মায়ের রসুনের গন্ধকে কী ভাবে নেবে, এটা শুধু তার উপরেই নির্ভর করে।

৭. চিনেবাদাম (peanuts) : খাবার হিসাবে পুষ্টিকর, কিন্তু কোনও কোনও সময়ে চিনেবাদামে অ্যালার্জি দেখা দেয়। চামড়া লাল হয়ে যাওয়া, একজিমা বা শ্বাসকষ্ট হয়। এই লক্ষণ দেখা দিলে চিনেবাদাম বা অন্যান্য বাদাম জাতীয় খাবার বন্ধ করতে হবে।

৮. আটা (wheat) : যে সব খাবারে অ্যালার্জি হতে পারে বা খেলে অনেকেরই সহ্য হয় না, আটা বা গমের খাবার তার মধ্যে অন্যতম। শিশুর যদি এই খাবারে অ্যালার্জি থাকে তবে শিশুর পেটে ব্যথা হবে, কাঁদবে এবং রক্ত পায়খানাও হতে পারে। এ সব হলে আটা জাতীয় খাবার ৩ সপ্তাহ বন্ধ করে দেখতে হবে শিশুর অবস্থার উন্নতি হয় কি না। যদি উন্নতি হয়, তবে বুঝতে হবে শিশুর এই খাবারে অ্যালার্জি আছে, তখন আটার রুটি বন্ধ করতে হবে।

৯. গোরুর দুধ বা দুগ্ধজাত খাবার (dairy product) : আমাদের দেশের অনেক মায়েরাই প্রথম থেকে তাদের শিশুকে গোরুর দুধ খাইয়ে থাকেন। কিন্তু অনেক শিশুরই গোরুর দুধ বা দুগ্ধজাত খাবারে অ্যালার্জি আছে। মা গোরুর দুধ খেলে দুধের অ্যালার্জি তৈরি করার অংশ মায়ের বুকের দুধের মাধ্যমে শিশুর পেটে যায়। শিশুর অ্যালার্জি থাকলে তার পেটে ব্যথা ও বমি হতে পারে। এর সঙ্গে ঘুমের ব্যঘাত ঘটে, একজিমা, চর্মরোগ এসবও হতে পারে। শিশুর গোরুর দুধে অ্যালার্জি থাকলে মাকে গোরুর দুধ খাওয়া বন্ধ করতে হবে।

১০. অন্যান্য খাদ্য : আরও কিছু খাবার আছে যা প্রায়ই অ্যালার্জির কারণ হয়। এর মধ্যে আছে ডিম, কাঁকড়া বা চিংড়িমাছ, অন্যান্য সামুদ্রিক মাছ বা সবজি। এমনকী, সয়াবিন, ভুট্টার চিপস, পুদিনা পাতা, পার্সলে পাতা, ইত্যাদিতে অ্যালার্জি থাকতে পারে। মা যদি জানেন, শিশুর কীসে অ্যালার্জি আছে, বা কোন খাবার খেলে শিশুর অসুবিধা হচ্ছে, তবে সেই খাবার মা ও শিশু উভয়েরই পরিত্যাগ করা উচিত। এ ছাড়া, শিশুর যদি পেটে গ্যাস বেশি হয়, পেটে ব্যথা হতে থাকে, বা অ্যালার্জির অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়, তবে মাকে তার খাবার নিয়ে ভাবতে হবে।

যে সব খাবার বুকের দুধ কমিয়ে দিতে পারে

কিছু কিছু খাবার যেমন বুকের দুধ বাড়ায়, তেমনি কিছু খাবার বুকের দুধ কমিয়েও দিতে পারে। এগুলো একদমই খাওয়া উচিত নয়। এর মধ্যে আছে— বাঁধাকপি (Cabbage), ভুঁই তুলসী (Sage), পুদিনা (Peppermint) ইত্যাদি। এ ছাড়া জল কম খেলে, ঘুম কম হলে, খাবার কম খেলে বা থাইরয়েডের গোলমালের জন্য (হাইপোথাইরয়েডিজম) বুকের দুধ কম হতে পারে।

বুকের দুধে বিষ (Toxin in breast milk) :

এ আবার কেমন কথা, বুকের দুধে বিষ? সত্যিই বুকের দুধে কোনও বিষ থাকে না। কিন্তু মা যে খাদ্য-খাবার খান, সেই খাবারের সঙ্গে যদি বিষ মেশে তবে তা বুকের দুধের মাধ্যমে শিশুর শরীরে প্রবেশ করে। এছাড়া ঘরের নানা জাতীয় রাসায়নিক থেকেও মায়ের শরীরে টক্সিন বা বিষ ঢুকতে পারে। তাই যদি কোনও বিষাক্ত পদার্থ বুকের দুধে পাওয়া যায়, তা আসলে পরিবেশের বিষ। বুকের দুধের বিষের মাত্রা দিয়ে তাই পরিবেশের বিষাক্ত পদার্থের মাত্রারও একটা আভাস পাওয়া যায়। পরিবেশ থেকে এবং খাবারের সঙ্গে আমরা বিভিন্ন রাসায়নিক গ্রহণ করি, যা বিষাক্ত। মায়ের স্বাস্থ্য এবং শিশুর দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যের পক্ষে যা ক্ষতিকর।

পরিবেশে যে সব বিষাক্ত পদার্থ মেশে, তার মধ্যে কিছু পদার্থ দীর্ঘমেয়াদি ভাবে পরিবেশে থেকে যায়, এদের বলে POP (Persistant Organic Pollutant) এরাই বেশি ক্ষতিকর। এই গ্রুপের মধ্যে আছে dioxin, DDT, PCBs (poly chlorinated biphenyle)— এই সব রাসায়নিকের উৎস ফসলে দেওয়া পোকা মারার বিষ, জীবাণু মারার বিষ, রঙ, প্লাস্টিকের রাসায়নিক ইত্যাদি। যে সব বিষ বুকের দুধে বেশি পাওয়া যায়, তার মধ্যে—

১. PCBs (Poly chlorinated biphenyle) : এগুলো আগে ইলেকট্রিক সরঞ্জামে ব্যবহার করা হত। বর্তমান এগুলোর ব্যবহার কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।
২. PVC (polyvinyl chloride) : বিভিন্ন খেলনা প্রস্তুতে, খাবার প্যাকেজিংয়ে, ঔষধপত্রে এর ব্যবহার আছে। এই বিষ আমাদের শরীরের হরমোনতন্ত্র, জননতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

প্রশ্ন আসতে পারে, তবে কি কৌটোর দুধ বেশি ভালো। না, তা নয়। কৌটোর দুধেও তৈরির সময়, প্যাকেট করার সময় বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ মিশতে পারে। তার মধ্যে প্রধান হল, বাইফেনল-এ, থ্যালেট, লেড ও অ্যালুমিনিয়াম, নাইট্রেট জাতীয় রাসায়নিক সার।

আমাদের খাদ্যবস্তু, শাক সবজি, বিভিন্ন ফলমূলেও এই সব রাসায়নিকের মাত্রা যথেষ্ট থাকে। যে সব খাদ্য বস্তুতে বেশি পরিমাণ রাসায়নিক পাওয়া গেছে তার মধ্যে আছে, আপেল, জাম, পালংশাক, স্ট্রবেরি, আঙুর, আলু, লেটুস, বেগুন ইত্যাদি। কম পরিমাণ বিষাক্ত পদার্থ থাকে পেঁয়াজ, আনারস, আম, বাঁধাকপি, তরমুজ, মিষ্টি আলু, মাশরুম ইত্যাদিতে।

কী করলে বুকের দুধে বিষাক্ত পদার্থের মাত্রা কমানো যাবে

১. গৃহস্থালির রঙ, ফার্নিচারের পালিশ, নেল-পালিশ, পেট্রলের ধোঁয়া এবং কীটনাশক পদার্থ থেকে দূরে থাকতে হবে।
২. খাদ্যশৃঙ্খলের নীচে যে সব খাবার থাকে, তাই খেতে হবে। যেমন, সবজি, ডাল, ছোটো মাছ ইত্যাদি। মাংস কম খেতে হবে।
৩. জৈব সারের খাবার বা জৈব খাবার বেশি খেতে হবে।
৪. তেলজাতীয় খাবার কম খেতে হবে। মাছের মোটা তেল বা মাংসের চর্বি বাদ দিয়ে খেতে হবে। যথাসম্ভব টাটকা খাবার খেতে হবে।
৫. কড লিভার তেল বা এই জাতীয় সামুদ্রিক মাছের তেল বাদ দিতে হবে।

স্তনদায়িনী মায়েদের মনে প্রায়ই একটা প্রশ্ন জাগে— কী খাব, কী খাব না? এবং কতটা খাব? আমাদের চারপাশে যে সব খাবার পাওয়া যায়, তার মধ্যে কোন খাবার দরকার, কোনটা খেলে শিশুর ক্ষতি হতে পারে, তার একটা আভাস দেওয়া গেল। তবে অবশ্যই মায়ের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ থাকবে। মাকে যেমন নিজের পুষ্টিগুণের খাবার খেতে হবে, তেমনি দেখতে হবে শিশুরও কোনও অসুবিধা না হয়। তবে এই সময় মাকে প্রয়োজনীয় খাবার দেওয়ার দায়িত্ব পরিবারের লোকেরই।

শেষ কথা

মা কতটা খাবেন, কখন খাবেন, তার হিসাব করা যায়, কিন্তু আমাদের সামাজিক পরিকাঠামোতে সেই হিসাবমতো চলা বোধ হয় সম্ভব নয়। আর খাবারের পরিমাণ ও মায়ের দেহ গঠন, ওজন এ সবের উপর নির্ভর করবে। তাই খাবারের পরিমাণের কোনও চার্ট উল্লেখ করা হল না। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে, মা প্রচুর জল খাবেন, সেই সঙ্গে শাক সব্জি ও টাটকা খাবার খাবেন। আর খাবারের পরিমাণ এক সঙ্গে বেশি না খেয়ে অল্প করে বার বার খেতে হবে। এ লেখা স্তন্যদায়িনী মায়ের কোনও উপকারে এলেই লেখার উদ্দেশ্য সার্থক হবে।

লেখক পরিচিতি : ডা. স্বপন বিশ্বাস, ডিসিএইচ, এমডি, শিশু বিশেষজ্ঞ। একটা সরকারি হাসপাতালে কর্মরত।

ক্যুইজের উত্তর

১. প্রথমে ফ্যাটি লিভার, তারপর অ্যালকোহল-জনিত লিভার প্রদাহ, ও সবশেষে সিরোসিস।
২. পুরুষদের ক্ষেত্রে দিনে ৬০-৮০ গ্রাম করে, আর নারীদের দিনে ২০-৪০ গ্রাম করে, দশ বছর ধরে অ্যালকোহল খেলে অ্যালকোহল-জনিত লিভারের অসুখ হবার সম্ভাবনা খুব বেশি।
৩. অ্যালকোহল-জনিত ফ্যাটি লিভার।
৪. অনেক ক্ষতি হয়; তবে তার মধ্যে রক্ততঞ্চনের অসুবিধা, নানা ওষুধ ও বিষ শরীর থেকে দূর না হওয়া, রক্তের নানা প্রোটিন তৈরি হতে না পারা খুব গুরুত্বপূর্ণ।
৫. লিভার কোষের পুনর্গঠনের ফলে উৎপন্ন গোটা (regenerative nodules) ও লিভার জুড়ে ফাইব্রোসিস (extensive hepatic fibrosis)। এই অস্বাভাবিকত্বগুলো দূর করা যায় না।
৬. হেপাটিক এনকেফ্যালোপ্যাথি। এতে মস্তিষ্কে 'নাইট্রো' যৌগে জমা হবার ফলে মস্তিষ্কের কোষগুলো খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এবং রোগী মারা যান।
৭. ঘুম ও জাগ্রত অবস্থা উল্টে যাওয়া (inverted sleep wake pattern), মানসিক আচ্ছন্নভাব (mental confusion), নাড়াচড়ার মধ্যে ঝাঁকুনিভাব (Jerky movements of limbs বা flappy tremors) এবং রোগীর মুখে বা নিঃশ্বাসে বিশেষ গন্ধ (fetor hepaticus)।
৮. একজন দীর্ঘমেয়াদি মদ্যপায়ীর রক্তে লিভার এনজাইম সমূহ (যথা AST, ALT, GGTP) এবং বিলিরুবিনের মাত্রা বেড়ে যাবে। লিভারের আল্ট্রাসাউন্ড করে ফ্যাটি লিভার দেখা যাবে। এছাড়া রক্তে কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রাও দেখা উচিত।
৯. অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস। অ্যালকোহল বন্ধ করে, প্রোটিন বেশি খাইয়ে, স্টেরয়েড ও অন্যান্য ওষুধ দিয়ে এই পর্যায়ে চিকিৎসা হয়।
১০. ২১ বছর বয়স।
১১. লিভার বায়োপ্সি।

‘সারোগেসি’ বা গর্ভদান

(পর্ব-১)

জননী, মা, গর্ভধারিনী— এগুলো তো সমার্থক শব্দ বলেই চলে। কিন্তু না, এখন এমন হচ্ছে, যে নারীর গর্ভ থেকে সন্তান জন্ম নিল, সে নারী সন্তানের মাতা নন। আইনত নন, এবং জৈবিক ভাবেও নন। এই বিষয়টা বুঝতে গিয়ে আমরা অনেকেই বেশ ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাই। আমাদের সাংস্কৃতিক সংকটও উপস্থিত হয় হয়তো বা। সংস্কৃতির ব্যাপারগুলো বড়ো জটিল, তবে জৈবিক ব্যাপারটা বোঝা খুবই সোজা— লিখছেন **ডা. কাঞ্চন মুখার্জি।**

বাসুদেব ও দেবকীর একটা করে সন্তান জন্ম নিচ্ছে, আর কংস তাকে মেরে ফেলছে। একবার নয়, ছয়-ছয়বার। সপ্তম সন্তানের বেলায় ভ্রূণ প্রতিস্থাপিত হল দেবকীর বদলে রোহিনীর গর্ভে। জন্ম হল বলরামের। স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র সম্পাদক মশাই শোনাতে বলেছিলেন বিজ্ঞান কথা, কিন্তু বলে ফেললাম কৃষ্ণকথা। ভগবানে বিশ্বাস করি না করি, গল্পকথকের কল্পনার তারিফ না করে পারি না। বলরামের জিনগত (Biological— জৈবিক) মা একজন, দেবকী। আর গর্ভধারিণী মা আর একজন—রোহিনী। তাজ্জব ব্যাপার তাই না! আর এই আজব ব্যাপারটারই নাম সারোগেসি!!

প্রথমেই প্রশ্ন আসে আমরা ‘সারোগেসি’ বলতে কী বুঝি। সন্তানের পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব লাভে ইচ্ছুক কোনও যুগলের হয়ে যখন অন্য কোনও নারী গর্ভধারণ করেন এবং সন্তানের জন্ম দেন, তখন তাকে বলে সারোগেসি, এবং সেই নারীকে বলে সারোগেট ‘মা’। ((Surrogacy is when another woman carries and gives birth to a baby for the couple who want to have a child)।

এখন কংস মামা না থাকলেও রোহিনীদের প্রয়োজন ফুরোয়নি। সারোগেসি এখন একটা স্বীকৃত চিকিৎসা পদ্ধতি। এর প্রয়োজন হয় যদি কোনও সন্তান-ইচ্ছুক মহিলা শারীরিকভাবে সন্তান ধারণে অক্ষম হন। উদাহরণ স্বরূপ, জরায়ু বা মাতৃগর্ভ, যেখানে ভ্রূণটি তিলে তিলে বড় হয়ে পূর্ণাঙ্গ মানবশিশু হয়ে ওঠে, সেটি অনুপস্থিত থাকলে; বা সেটার গঠনগত সমস্যা থাকলে (malformation) সারোগেসির সাহায্য নেওয়া হয়। এছাড়া বারবার মিসক্যারেজ (recurrent pregnancy loss) থাকলে। এবং যে সব ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্বের অত্যাধুনিক চিকিৎসা অসফল, সেখানেও কখনও কখনও সারোগেসি করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

কত কথা ভাবে লোকে

সারোগেসি নিয়ে অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে, আছে হাজার কুসংস্কার। বিষয়টা যে একেবারে সহজ সরল তা হয়তো নয়, কেন না নানা রকম নৈতিক ও আইনি সমস্যা উঠতে পারে, এবং হরবখত উঠছেও। কিন্তু চিকিৎসা পদ্ধতির দিক থেকে, এটা বিশেষ এক সমস্যার একটা বেশ উন্নত মানের বৈজ্ঞানিক (বা প্রযুক্তিগত) সমাধান। এই পদ্ধতির সাহায্যে জন্মানো বাচ্চারা আর পাঁচটা বাচ্চার মতোই সুস্থ স্বাভাবিক হয়। ‘স্বাস্থ্যের বৃত্তে’-র এই সংখ্যায় আমি পাঠকদের এই চিকিৎসা পদ্ধতির সম্পর্কে কিছু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। পরের সংখ্যায় বলব এই বিষয়ে কিছু আইনি জটিলতা ও নৈতিক সংকটের কথা। বিজ্ঞানের অপব্যবহার ও আর্থসামাজিক বিষয় নিয়ে দু’একটা অনধিকার চর্চাও করব হয়তো বা।

কত রকমের সারোগেসি

সারোগেসি মূলত দু’ ধরনের হয়। সম্পূর্ণ (Full) এবং আংশিক (partial)। সম্পূর্ণ সারোগেসি আবার তিন রকম ভাবে করা যেতে পারে। এক, ইচ্ছুক মায়ের ডিম্বাণু পুরুষের শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত করার পর অন্য এক নারীর গর্ভে তা প্রবেশ করানো হয়। এই ‘সন্তান পেতে ইচ্ছুক যুগল’-এর পোশাকি নাম

হল Commissioning Parents—কমিশনিং পিতামাতা। এখন থেকে আমরাও এঁদের কমিশনিং পিতা বা মাতা হিসাবে ডাকব। অন্যদিকে, যে মহিলা গর্ভধারণ করবেন, তাঁকে আমরা বলব 'সারোগেট'।

সম্পূর্ণ সারোগেসি-র দ্বিতীয় উপায় হল, অজানা কোনও সুস্থ মহিলার ডিম্বাণুর সঙ্গে কমিশনিং পিতার শুক্রাণুর মিলনে উৎপন্ন ভ্রূণ সারোগেট 'মা'-এর গর্ভে প্রতিস্থাপন। আর তৃতীয় উপায় হল, অজানা কোনও সুস্থ নারীর ডিম্বাণু ও অজানা কোনও সুস্থ পুরুষের শুক্রাণুর মিলনে উৎপন্ন ভ্রূণ সারোগেট 'মা'-এর গর্ভে প্রতিস্থাপন। এই অজানা নারী ও পুরুষ দাতা দু'জনের মধ্যে কোনও বৈবাহিক সম্পর্ক বা আত্মীয়তা না থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রসঙ্গত, সম্পূর্ণ সারোগেসির আরও দু'টো চালু নাম আছে— হোস্ট (Host) সারোগেসি এবং জেস্টেশনাল (Gestational) সারোগেসি।

আংশিক সারোগেসির ক্ষেত্রে, কমিশনিং পিতার শুক্রাণুর সঙ্গে সারোগেট 'মা'-এর ডিম্বাণুর মিলনে ভ্রূণ তৈরি হয়। সাধারণত এই ডিম্বাণু শুক্রাণু মিলনটি করা হয় আই ইউ আই (IUI) বলে একটা পদ্ধতিতে। আই ইউ আই পদ্ধতিটা সারোগেসি ছাড়া অন্য রকম বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসাতেও খুব চালু। পুরুষ ও নারীর শারীরিক মিলনের কোনও প্রয়োজনই নেই এখানে। বলিউডি সিনেমায় দেখানো হয় বটে কমিশনিং পিতা 'বাধ্য হচ্ছেন' সারোগেট 'মা'-এর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করতে, কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রে এরকম পরামর্শ কদাপি দেওয়া বলে বর্তমান লেখকের অন্তত জানা নেই।

'মাতৃত্বকাল' কী ভাবে কাটে

গর্ভধারণের পর সারোগেট 'মা'-এর চিকিৎসা ও প্রসবের পদ্ধতি আর পাঁচজন অন্তঃসত্ত্বার মতোই। কিন্তু গর্ভধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে দু-চার কথা বলা খুব দরকার। 'সম্পূর্ণ সারোগেসি'-তে গর্ভসঞ্চার করানো হয় আইভিএফ পদ্ধতি দ্বারা। আইভিএফ অর্থাৎ ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (In Vitro Fartilisation) মানে মানুষের শরীরের বাইরে শুক্রাণু দ্বারা ডিম্বাণু নিষিক্তকরণ। আমি জানি না, মানুষের কল্পনার কোনও মোক্ষম মোচড়ের ফলে এই ব্যাপারটা 'টেস্ট টিউব বেবি' বলে পরিচিত হয়েছে।

সে যা হোক, আইভিএফ পদ্ধতিতে প্রথমে ডিম্বাণুদাত্রী নারীর শরীরে কিছু ওষুধ প্রয়োগ করে অনেকগুলো ডিম্বাণু এক সঙ্গে পরিপক্ক অবস্থায় আনা হয়। সেই ডিম্বাণুগুলো এরপর নারীর শরীরের বাইরে আনা হয় ও পুরুষের শুক্রাণুর সঙ্গে মেলানো হয়। ফলে তৈরি হয় ভ্রূণের প্রথম কোষ বা জাইগোট।

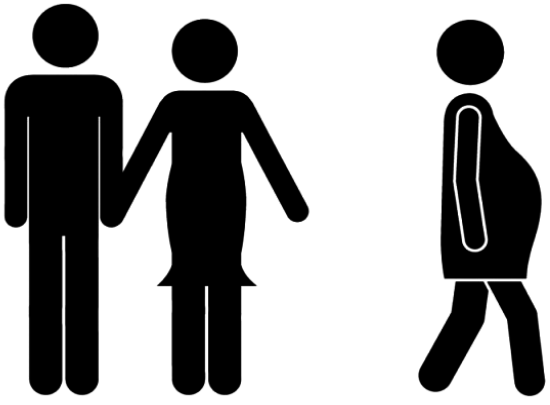

অবশ্য ব্যাপারটা যেমন বললাম, সে রকম ডিম্বাণু-শুক্রাণু মিশিয়ে দিলেই কার্যকর জাইগোট তৈরি হয়ে গেল, তেমন সোজা নয়। কিন্তু টেকনিক্যাল ডিটেলে না গিয়ে, ব্যাপারটার মূল পদ্ধতিটা এই রকমই। এর নির্দিষ্ট সময় পরে ভ্রূণটা সারোগেট 'মা'-এর গর্ভে প্রতিস্থাপন করা হয়। তবে ভ্রূণ প্রতিস্থাপনের আগে সারোগেট 'মা'-কে কিছু ওষুধপত্র দিতে হয় যাতে তাঁর জরায়ু গর্ভধারণের জন্য তৈরি হয়ে ওঠে। যদি 'ভাল' ভ্রূণের সংখ্যা একাধিক থাকে, তবে উদ্বৃত্ত ভ্রূণগুলোকে ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য হিমায়িত করে সংরক্ষণ করা হয়।

সাফল্যের হার

এই আই ভি এফ (ও তার ফলে সারোগেসি) পদ্ধতির সফলতার হার কী রকম? আবার তারও আগে প্রশ্ন তুলতে হয় সাফল্যের সংজ্ঞা নিয়েই। অর্থাৎ আমরা সারোগেট 'মা'-এর গর্ভে সন্তান এলে সেটাকেই সাফল্য বলব, না কি জীবিত সন্তানের জন্ম হলে তবেই সেটাকে সাফল্য বলব? ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের মতো দেশে আইভিএফ বা যে কোনও প্রজনন সহায়ক প্রযুক্তি (Assisted Reproductive Technique [ART]) -এর জন্য নিয়ামক সংস্থা (যেমন Human Fertilization and Embryo Authority)-র কাছে জীবন্ত শিশু জন্মের হারই (Live birth rate) হল সাফল্যের হার। ভারতবর্ষে ART নিয়ে কোনও নিয়ামক সংস্থা নেই। ফলে বিভিন্ন ক্লিনিক যে সাফল্যের হার দাবি করে, সেটা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়। তাই সেই সব ক্লিনিক-ভিত্তিক সাফল্যের পরিসংখ্যানে যাচ্ছি না, বরং দেখি আইভিএফ পদ্ধতি ভিত্তিক সারোগেসির সাফল্য কোন্ কোন্ ব্যাপারের উপর নির্ভর করে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, ডিম্বাণুদাতা 'মা' ও সারোগেট 'মা'-এর বয়স। দু'জনের বয়স যত বাড়বে সাফল্যের হার তত কমবে। তা ছাড়া ডিম্বাণুর গুণমান, সারোগেট 'মা'-এর স্বাস্থ্য ও সুস্থ থাকা ও ক্লিনিকের পদ্ধতির উৎকর্ষ— এগুলো সাফল্যের জন্য নির্ণায়ক কিছু ব্যাপার। সার্বিকভাবে বলতে গেলে আইভিএফ পদ্ধতিতে চেষ্টা করলে, প্রতি তিনজনে একজন মাত্র একটা জীবিত শিশু নিয়ে বাড়ি যান (Take Home Baby Rate)। অবশ্য মনে রাখবেন, আমি কিন্তু অতি-সরলীকরণ করলাম। কেন না কতবার আইভিএফ করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে সেটা বিচার্য বিষয়, এবং প্রতিবার কতগুলো ভ্রূণ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে তাও খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

hindusta

Mumbai / METRO Rs 2.50 (Rs. 3.00 for Pune only) Vol. VI No 146

NIFTY 5,262.60 +2.8 SENSEX 17,570.80 +3.0 DOW JONES 10,450.64 +2.3 NASDAQ 2,309.80 +3.0

CAMPUS CALLING

Surrogacy not for married couples only: Draft law

CHANGE COMING Proposed legislation gives gays, singles legal right to have surrogate babies

short stories

TEENAGER DIES, SRINAGAR TENSE

hindustantimes SPECIAL

SOCIAL REVOLUTION

আংশিক সারোগেসি (Partial Surrogacy)-তে ডিম্বাণু নিষেক ঘটানো হয় মূলত আই ইউ আই (IUI–Intra Uterine Insemination) পদ্ধতির দ্বারা কমিশনিং পিতার নিস্খলিত (ejaculated) বীর্য (semen) কৃত্রিম পদ্ধতিতে সারোগেট 'মা'-এর গর্ভে সঞ্চার করা হয়। সাধারণ মানুষ IUI পদ্ধতিতে চলতি কথায় বলেন semen pushing (বীর্য ঢোকানো)। আইভিএফ-এর তুলনায় এই পদ্ধতি (IUI) কম খরচ সাপেক্ষ, অবশ্য এতে সাফল্যের হারও আইভিএফ-এর চাইতে কম। ভারতবর্ষে আংশিক সারোগেসি আইন বিরুদ্ধ, কারণ এতে বাচ্চার সঙ্গে সারোগেট 'মা'-এর জৈবিক সম্পর্ক থেকে যায়। অর্থাৎ সারোগেট 'মা'-এর ডিম্বাণু থেকেই বাচ্চা তৈরি হয়, সুতরাং সে সারোগেট 'মা'-এর স্বাভাবিক আর পাঁচটা সন্তানের মতোই প্রাকৃতিক ও জৈবিক সন্তান। সারোগেট 'মা' হবার প্রথম শর্তই হল বাচ্চার উপর সেই 'মা'-এর কোনও দাবি থাকবে না। জৈবিক মা-র সন্তানের উপর কোনও দাবি থাকবে না, ভারতের আইন ব্যবস্থা এতটা মেনে নেয়নি।

সারোগেসির ঝুঁকি

যে কোনও চিকিৎসা পদ্ধতিতে কিছু না কিছু ঝুঁকি থেকেই যায়, সারোগেসিও তার ব্যতিক্রম নয়। এই পদ্ধতিতে অনেক ওষুধ ব্যবহার করতে হয়— ডিম্বাণুদাতা মায়ের বহু ডিম্বাণু এক সঙ্গে পরিপক্ক করতে, এবং সারোগেট 'মা'-এর জরায়ুকে ভ্রূণ ধারণের উপযোগী করে তুলতে। বর্তমানে সেই সব ওষুধ বেশ উন্নত— সেগুলোর তেমন মারাত্মক পার্শ্বক্রিয়া নেই বললেই চলে। তার চাইতে অনেক সহজপ্রাপ্য এবং বড় সমস্যা হল বহু গর্ভসঞ্চার (Multiple pregnancy)। একের বদলে একসঙ্গে দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা ভ্রূণ গর্ভে সহাবস্থান করে। এসব ক্ষেত্রে গর্ভধারিণীর কিছু সমস্যা হতে পারে। যেমন উচ্চ রক্তচাপ। কিন্তু মূল সমস্যা হল অপরিণত অবস্থায় বাচ্চার জন্মগ্রহণ: পুরো গর্ভকাল অতিবাহিত হওয়ার আগে অপরিণত বাচ্চার জন্ম। দুটো বাচ্চা (যমজ) হলে, জন্মের আগে এবং জন্মের এক সপ্তাহের মধ্যে বাচ্চার মৃত্যুর হার একটা মাত্র বাচ্চার চেয়ে সাতগুণ বেশি। সেরিব্রাল পলসি নামক গুরুতর মস্তিষ্কের অসুখের সম্ভাবনা এক জোড়া যমজের ক্ষেত্রে পাঁচগুণ বেশি, এবং এক সঙ্গে তিনটে বাচ্চা হলে এই সম্ভাবনা আঠারো গুণ বেশি। (সূত্র - HFEA, UK) এই সমস্ত ঝুঁকি চিকিৎসা শুরুর আগে বুঝিয়ে বলতে হবে— চিকিৎসক ঝুঁকির ব্যাপারে অবহিত করবেন সব পক্ষকেই।

চুক্তি

ডিম্বাণুদাত্রীর বয়স ২১ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হওয়া চাই, আর শুক্রাণুদাতার বয়স ২১ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে হওয়া চাই। সারোগেট 'মা'-এর বয়স ৪৫ বছরের কম হওয়া দরকার— এছাড়া বিভিন্ন পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া হয় তিনি যথাসম্ভব রোগমুক্ত, এবং তাঁর সন্তান ধারণের ক্ষমতা আছে। তিনি কমিশনিং মা-বাবার আত্মীয় বা বন্ধু হতে পারেন; আত্মীয় হলে একই প্রজন্মের হওয়া উচিত। চুক্তির একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে। চুক্তি অনুযায়ী কমিশনিং মা-বাবা সারোগেট 'মা'-কে তাঁর সারোগেট গর্ভধারণ সংক্রান্ত সমস্ত খরচ দিতে বাধ্য থাকেন। চুক্তিটি হয় এই তিন ব্যক্তির মধ্যে, ক্লিনিক বা চিকিৎসক এই চুক্তির অংশীদার নয়। আইন অনুযায়ী কোনও নারী তাঁর জীবনে তিন বারের বেশি সারোগেট হতে পারেন না।

সারোগেসির গোপনীয়তা বজায় রাখা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে এবং ক্লিনিক / চিকিৎসকের পক্ষেও, অবশ্য কর্তব্য। এভাবে যে শিশুটা জন্মালো, তার ১৮ বছর বয়স হলে সে তার জৈবিক পিতা-মাতা ও সারোগেসি সম্পর্কে সব তথ্য জানতে চাইতে পারে। তবে এক্ষেত্রে তাঁদের ব্যক্তিগত তথ্য যথা নাম, ঠিকানা ইত্যাদি জানানো বাধ্যতামূলক নয়, কিন্তু তাঁদের স্বাস্থ্যসম্পর্কিত তথ্য, শিক্ষামান, অন্যান্য যোগ্যতা ইত্যাদি জানাতে হবে।

শেষ হয়েও

এবারের লেখার শেষ পর্যায়ে এসে আপনাদের একটা প্রশ্ন করি। ধরুন সারোগেট 'মা'-এর প্রসব হল। একটা সুস্থ বাচ্চা জন্ম নিল। এবার বলুন তো, বার্থ সার্টিফিকেটে বাচ্চা বাবা-মা হিসেবে কাদের নাম লেখা হবে? সারোগেট মা হাসপাতালে যখন প্রসববেদনা নিয়ে ভর্তি হবেন, তখন তিনি কি তাঁর আসল নামটা দিয়ে ভর্তি হবেন? শিশুর পরিচয়, তার জন্মদাত্রী মায়ের পরিচয়, কি ভাবে লুকিয়ে থাকবে? তার আইনী ব্যবস্থা কী? নৈতিক দিকই বা কী? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আসবে পরের সংখ্যায়। ততদিন সবুর করুন।

লেখক পরিচিতি : ডা. কাঞ্চন মুখার্জি, এমবিবিএস, এমআরসিওজি, স্ত্রীরোগ বিদ্যা ও ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

মেয়েদের মনের অসুখ

মনের অসুখ মানে যদি একেবারে চূড়ান্ত 'পাগলামি' হয়, তো আমাদের সমাজ তাঁকে অবহেলা করে, বা তাঁকে নিয়ে মজা করে। আর যদি আপাত সুস্থ মানুষ অযৌক্তিক আচরণ শুরু করেন, তখন তাঁর মানসিক সমস্যাটা অন্যদের কাছে 'বজ্জাতি' বলে মনে হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে সমাজের এই নেতিবাচক মনোভাব আরও বেশি, আরও প্রকট, এবং আরও হিংস্রও। সেই মনোভাব বদলাতে হবে— লিখছেন **রুমঝুম ভট্টাচার্য।**

মনের অসুখ সম্বন্ধে আজও সাধারণ মানুষের মনে অনেক ভুল ধারণা ও কুসংস্কার জমা হয়ে আছে। মনের অসুখ, সহজ কথায় যাকে বলা হয় পাগলামো, সে সম্বন্ধে সমাজে আজও এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। পেটের অসুখ বা হার্টের অসুখ করেছে জানলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য মানুষ বিশেষ চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন মনে করে না। কিন্তু মনের অসুখ হয়েছে জানলেই কেমন জানি অসুস্থ মানুষটাকে ঘিরে তার পরিবারের লোকজন এক অস্বস্তি অনুভব করে, বিশেষ করে মানুষটা যদি 'মেয়েমানুষ' হয়। অবিবাহিত হলে তো কথাই নেই— তার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে সংশয় তৈরি হয়! আর বিবাহিতা মেয়েদের অনেক সময়েই পরিবার থেকে বিসর্জন দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। বিষয়টাকে যদি একটু অন্য দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করা হয়, তবে দেখা যায় প্রতিকূল সামাজিক পরিস্থিতি, মেয়েদের প্রতি বৈষম্য, প্রকৃত শিক্ষা ও পুষ্টির অভাব মেয়েদের বিভিন্ন মানসিক রোগের শিকার করে তুলছে। হয়তো মদ্যপ স্বামীর অত্যাচার বা চরম দারিদ্র্য বা পুরুষপ্রধান সমাজের আক্রোশ যখন নিরন্তর দৈহিক ও মানসিক অত্যাচারের মাধ্যমে কোনও মেয়ের উপর আছড়ে পড়ে সে 'পাগলামো'-র শিকার হয়ে পড়ে। অথচ তার মানসিক অসুখের কারণ বিচার না করেই, অসুস্থ মানসিকতার দোহাই দিয়ে তাকে বর্জন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মেয়েদের কী কী মানসিক অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, সেগুলোর উপসর্গ কী, প্রধানত কী কারণে এই মানসিক অসুখগুলো হতে পারে সে সম্বন্ধে এই নিবন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে, যাতে মানসিক রোগ সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হয় ও শরীরের অসুখের মতোই চিকিৎসার ব্যাপারে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা আমাদের সমাজের মানসিক রোগগ্রস্ত মেয়েদের প্রতি যত্নবান হতে শেখায়।

বিষাদ রোগ (Depression) :

মেয়েদের মধ্যে বেশি দেখা যায় এমন মানসিক অসুখগুলোর মধ্যে অন্যতম হল বিষাদ রোগ। বিষাদ রোগ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। প্রধান বিষাদ রোগ (Major Depressive Disorder) মেয়েদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। এই রোগের উপসর্গ হল—

ক. বিষাদগ্রস্ত মেজাজ এবং প্রাত্যহিক কাজ-কর্মে অনীহা।

খ. যে কোনও ধরনের কাজে উৎসাহহীনতা।

গ.সামাজিক, কর্ম-ক্ষেত্র সংক্রান্ত বা শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা।

আরও বিশদে উপসর্গগুলো নিম্নলিখিত—

ক. খিট্‌খিটে বা বিষাদগ্রস্ত মেজাজ

খ. কাজে উৎসাহহীনতা

গ. ওজন ও খিদের তারতম্য

ঘ. ঘুমের পরিবর্তন— অতিরিক্ত কম ঘুম বা অতিরিক্ত বেশি ঘুম

ঙ. কর্মক্ষমতার পরিবর্তন— অতিরিক্ত বেশি কর্মক্ষমতা বা অতিরিক্ত কম কর্মক্ষমতা

চ. ক্লান্তিবোধ ও এনার্জি ক্ষয়
ছ. পাপবোধ ও আত্মবিশ্বাসের অভাব
জ. মনঃসংযোগের অসুবিধা
ঝ. মৃত্যু চিন্তা ও আত্মহননের চিন্তা।

এই নয়টা উপসর্গের পাঁচটা দু'সপ্তাহকাল ধরে লক্ষ করা গেলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

উদ্বেগ (Anxiety Disorders) :

উদ্বেগ অনেক ধরনের হয়। কোনও বিশেষ পরিস্থিতি বা জন্তু বা উচ্চতা ইত্যাদি থেকে অনেক সময় মনে ভয়জনিত উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। একে ফোবিয়া বলা হয়। ফোবিয়া মেয়েদের মধ্যে পুরুষদের তুলনায় বেশি দেখা যায়। যে বিষয়ে মনে ভয় জন্মাচ্ছে যদি দেখা যায় বাস্তব পরিস্থিতি বা বস্তুতে সেই পরিমাণ ভয় তৈরি হওয়ার কোনও বাস্তব সম্মত ব্যাখ্যা নেই তবে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

আর এক ধরনের উদ্বেগজনিত অসুখ মেয়েদের মধ্যে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। সেটা হল জেনারালাইজড্ অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার। এই রোগের উপসর্গগুলো যথাক্রমে হল—

ক. অস্থির ভাব
খ. সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়া
গ. মনঃসংযোগে অসুবিধা ও কখনও কখনও চিন্তাশক্তি লোপ পাওয়া (going blank)

ঘ. খিট্‌খিটে ভাব
ঙ. পেশিতে টান ধরা
চ. ঘুমের অসুবিধা

এই ৬টা উপসর্গের অন্তত ৩টি ছয়মাস ধরে দেখা দিলে ও এই উদ্বেগের কারণে কারও সামাজিক, কর্মজীবন বা প্রাত্যহিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকলে অবশ্যই ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নেওয়া উচিত।

বাতিকগ্রস্ততা (Obsessive Compulsive Disorder) :

মেয়েদের মধ্যে শুচিবাইগ্রস্ততা প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়।

মাথার মধ্যে এমন কিছু ধারণা বা চিন্তা ঘুরতে থাকে যেগুলো ক্রমাগত উদ্বেগের জন্ম দেয়। আক্রান্ত মানুষটা বুঝতে পারে ধারণা বা চিন্তাটা অমূলক তবু সে সেই ধারণা বা চিন্তার থেকে নিজেকে বের করে আনতে পারে না। ফলত তার উদ্বেগ বাড়তেই থাকে। তখন সেই উদ্বেগ থেকে মুক্তি পেতে সে এমন কিছু কাজে লিপ্ত হয় যা অস্বাভাবিক ও তার প্রাত্যহিক জীবন সেই ক্রিয়াকর্মে ভয়ানক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন— অনেক মেয়ের মধ্যে দেখা যায় সব কিছু পরিষ্কার রাখার বাতিক। তার মনে হয় তাকে কেউ ছুঁলেই গায়ে নোংরা লেগে যাচ্ছে ফলে তাকে কেউ স্পর্শ করলেই সে স্নান করে ফেলছে। হয়তো দেখা যাচ্ছে সে দিনে কুড়িবার স্নান করছে। ফলে তার স্বাভাবিক জীবনযাপন ভয়ানক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাতিকগ্রস্ততা স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে অবশ্যই ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নেওয়া উচিত।

মানসিক চাপ-জনিত অসুখ (Acute Stress Disorder) এবং দুর্ঘটনাজনিত মানসিক চাপ সংক্রান্ত অসুখ (Post-traumatic Stress Disorder) :

মানসিক চাপজনিত অসুখ অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। এই রোগে বিষাদ (depression), উদ্বেগ (anxiety), পরিস্থিতি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার প্রবণতা (withdrawal) ইত্যাদি প্রবলভাবে দেখা যায়। তবে এই উপসর্গগুলো মানসিক চাপের উৎস ঘটনা বা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার মূলত কোনও অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার কারণে দেখা যায়। দেশে যুদ্ধ লাগলে, ধর্ষণ বা অত্যাচারের ফলে কিংবা কোনও ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার কবলে পড়লে, ব্যক্তিমানসে তা এক দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে। ঘটনা ঘটার ৬ মাস পরেও এই অসুখ দেখা যেতে পারে। অতিরিক্ত সংবেদনশীল হয়ে পড়া, উদ্বেগ ইত্যাদি দেখা দিলে ডাক্তার দেখানো দরকার।

সোমাটিক সিম্পটম্ ও অন্যান্য কিছু ঐ ধরনের অসুখ (Somatic Symptom and Related Disordrs) :

এই অসুখ মেয়েদের মধ্যে প্রায়শই দেখা যায়। অনেক সময় দেখা যায় অনেক রকম শারীরিক উপসর্গ (somatic symptoms) বহু বছর ধরে দেখা যাচ্ছে। সেগুলো বিভিন্ন চিকিৎসা বিভাগে চিকিৎসা করানো হয়েছে, প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষাও (medical tests) করানো হয়েছে কিন্তু শারীরিক কোনও রোগ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার সঙ্গে মানুষটার আচরণ বা চিন্তাভাবনার মধ্যে

কিছু ম্যাল-অ্যাডাপটিভ্ ধরন পাওয়া যায় তবে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এই ধরনের রোগীদের হাজারও সমস্যা দেখা যায় যেমন—

ক. বমি বমি ভাব
খ. ব্যথা ও যন্ত্রণা
গ. দমবন্ধ হয়ে আসা
ঘ. মাথা ঘোরা
ঙ. ঢোঁক গিলতে অসুবিধা
চ. হাত-পা জ্বালা করা
ছ. বুক ধড়ফড়, ইত্যাদি।

এই সব উপসর্গ অনেক চিকিৎসা করেও ঠিক হতে পারে না, কারণ শারীরিক কোনও অসুখ খুঁজে পাওয়া যায় না।

সোমাটিক ডিজঅর্ডারের মতোই আর এক ধরনের অসুখ হল হাইপোকনড্রিয়াসিস্। এই অসুখও মেয়েদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। একে অসুখের ভয়ও বলা যেতে পারে। এই অবস্থায় রোগিণীর মাথায় সব সময়ে ভয়ানক কোনও অসুখে ভোগার চিন্তা ঘুরতে থাকে, যদিও পরীক্ষা করে কোনও অসুখের উপস্থিতি পাওয়া যায় না। অনেক সময়ই আক্রান্ত মানুষটা বুঝতে পারে যে অসুখ হওয়ায় ভয়টা নেহাতই অমূলক, তবুও এর থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারে না।

হিস্টিরিয়া বা কনভার্সান ডিসঅর্ডার (Coversion Disorder) :
এই অসুখটাও মহিলাদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। এই অসুখ হলে রোগীর অনেক সময় কাঁপুনি বা ফিট্ হয়। অনেক ক্ষেত্রে প্যারালাইসিস্ দেখা যায় ও কোনও বিশেষ অঙ্গ কাজ করে না। কোনও বিশেষ অঙ্গে ব্যথার উপসর্গ দেখা দিতে পারে বা অন্ধ হওয়ার ঘটনাও ঘটে। ডাক্তারি পরীক্ষায় কোনও দৈহিক অসুবিধা খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক সময় রোগীর স্মৃতিভ্রংশ দেখা দেয় ও আচ্ছন্নভাবও লক্ষ্য করা যায়।

উপরে যে সব মানসিক অসুখের কথা আলোচনা করা হল সেগুলো মেয়েদের বেশি দেখা যায়, যদিও পুরুষরাও এমন রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। কিন্তু এমন কিছু মানসিক অসুখ আছে, যা একমাত্র মেয়েদেরই হতে পারে। সেগুলো সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানানো হচ্ছে।

প্রিমেনস্ট্রুয়াল সিনড্রোম
(Premenstrual Syndrome) :
মাসিক রজস্রাবের পাঁচ থেকে দশ দিন আগে (ঋতুচক্রের শেষ ১/৩ অংশে) অনেক মহিলার কিছু উপসর্গ দেখা যায়, যেমন — বিষাদগ্রস্ত মন, খিটখিটে মেজাজ, উদ্বেগ, রাগ ও বিরক্তি। এছাড়া সন্ধিস্থলে (joint) ব্যথা, ওজন বৃদ্ধি, মাথা ঘোরা ইত্যাদিও দেখা যেতে পারে। এই অসুবিধাগুলো অবশ্য মাসিক ঋতুচক্র পূর্ণ হয়ে গেলে আপনা থেকেই কমে যায়। এই অসুখেরও চিকিৎসা সম্ভব।

পোস্ট পার্টাম সাইকোসিস্ (Postpartum Psychosis):
শিশু সন্তান প্রসবের পর অনেক মহিলার কিছু উপসর্গ দেখা যায়, যেমন— চূড়ান্ত অনিদ্রা, যখন তখন অযথা হাসি বা কান্না। অস্বাভাবিক আচরণ যেমন অতিরিক্ত চঞ্চলতা, উত্তেজনা, অবিশ্বাস, আত্মহত্যার চিন্তা, বিষাদ, উদ্বেগ ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন হলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

মেয়েদের মনের অসুখের কারণ বিভিন্ন। মেয়েদের আর্থসামাজিক অবস্থান আমাদের দেশে আজও সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। বিভিন্ন ধরনের মানসিক চাপ কী ভাবে মোকাবিলা করতে হবে সে বিষয়ে তাদের জ্ঞান সীমিত। তাই অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন উপসর্গের মাধ্যমে তারা তাদের অবদমিত ইচ্ছা ও চাহিদার প্রকাশ ঘটায়। হিস্টিরিয়া অসুখের প্রধান কারণ তাই। আবার উপসর্গের মাধ্যমে তারা অনেক সময় উদ্বেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় ও সাময়িক স্বস্তি পায়। যেমন— বাতিকগ্রস্ততার অসুখ। সাধারণ মানুষ যদি এই মানসিক অসুখগুলো সম্বন্ধে সজাগ হন ও মেয়েদের প্রতি আর একটু যত্নবান হন তবে আমরাও সবাইকে নিয়ে এক সুস্থ সমাজের স্বপ্ন দেখতে পারি।

লেখক পরিচিতি : রুমঝুম ভট্টাচার্য, মনোবিদ (ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট) ও প্রাবন্ধিক। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

ADVERTISEMENT

সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়ক ত্রৈমাসিক

পরিপ্রশ্ন

পাওয়া যায় : বুকমার্ক পাতিরাম, বইচিত্র (কলেজ স্ট্রিট), বিধাননগরে সুনীলের দোকান, রাসবিহারী মোড়।
এ ছাড়া নৈহাটি, ব্যারাকপুর, শ্যামনগর, কল্যাণী, শ্রীরামপুর, বনগাঁ ও ত্রিবেণী রেল স্টেশনে।

ADVERTISEMENT

With Best Compliment from

SHINE PHARMACEUTICALS LTD.

P-77, KALINDI HOUSING ESTATE

KOLKATA - 700089

ভূতের ভর

অলকেশ মণ্ডল

শান্ত গ্রামের পরিবেশ হঠাৎ চঞ্চল হয়ে পড়েছে। হারান মণ্ডলের নতুন বউকে 'ভূত'-এ ধরেছে। মাস কয়েক হল বিপত্নীক হারান মণ্ডলের সংসারে নতুন বউ এসেছে। আর আজ পড়শিরা ঘিরে ধরেছে নতুন বউকে। তার কথাবার্তা আচরণ আর নতুন বউয়ের মতো নয়।

হারান মণ্ডলের তিন বছরের মা-মরা শিশুর প্রাণ ওষ্ঠাগত। নতুন বউ তাকে ধরে জোর করে আদরে আদরে অতিষ্ঠ করে তুলছে। বাচ্চা ছেলেটা নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করেও বিফল হচ্ছে আর চিৎকার করে কেঁদে উঠছে। অন্য দিকে নতুন বউ কোনও অদৃশ্য ডাইনির হাত থেকে ছেলেকে বাঁচাতে ততোধিক উদ্যমে তাকে বুকে চেপে ধরছে। পড়শিরা এতক্ষণে বুঝে গেছেন,যে হারান মণ্ডলের প্রথম পক্ষ ফিরে এসেছে ছেলের টানে। নতুন বউয়ের মুখ দিয়ে যা যা কথা বের হচ্ছে, সব যেন প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মতো। শুধুমাত্র আদর নয়, মাঝে মাঝে নতুন বউ লজ্জা ভুলে সর্বসমক্ষেই কোলের ছেলেকে স্তন্যপানেও উদ্যত হচ্ছে। পড়শিরা নানা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছে। তার উত্তরে কখনও রাগ, কখনও অভিমান ঝরে পড়ছে নতুন বউয়ের আচরণে কথাবার্তায়।

শেখপাড়া থেকে একজন মৌলবীকে ডেকে আনা হয়েছিল। ভূতের হুমকিতে বা নিজের অক্ষমতা ঢাকতে সে জানিয়েছে, এটা তার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না, জিনের ভর হলে দেখা যেত। অবশেষে খুঁজে পেতে দূর গ্রামের বড়ো গুনিনকে ডাকা হয়েছে। তার আগমনের খবরে ভিড় আরও বেড়েছে। গুনিনের হুকুম তামিল করতে হারান মণ্ডল ব্যস্ত। ঝাঁটা, জুতো, মাটির হাঁড়ি, গামছা, সরা, সরষে, হলুদ, লঙ্কা, প্রভৃতি নানা প্রকার জিনিস সংগ্রহ করে গুণিনের কাছে এনে রাখছে।

উঠোনে বড়ো করে গণ্ডি কাটা হয়েছে চুন দিয়ে। তিনজনকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে গণ্ডির ভিতর থাকার জন্য। ওরা নতুন বউকে জোর করে গণ্ডির মধ্যে আটকে রেখেছে। চলছে গুনিনের মন্ত্রপাঠ, সঙ্গে অল্পবিস্তর গালাগাল। এছাড়া জুতো নাকে শোঁকানো, ঝাঁটা পেটা, হলুদ পুড়িয়ে নাকে ছ্যাঁকা, মন্ত্রপড়া সরষে ছুঁড়ে মারা প্রভৃতি নানা ক্রিয়াকর্ম। এর সঙ্গে নিজের ঢাক পেটানো— কবে কোন বদমাইশ ভূতকে কী ভাবে তাড়িয়েছিল তার ফিরিস্তি। কৌতূহলী জনতাকে দূরে দাঁড়ানোর নির্দেশ এবং গণ্ডির ভিতর যাতে না ঢুকে পড়ে তার জন্য বারেবারেই সাবধান করে দিচ্ছে। গুনিনের কাণ্ডকারখানা দেখে মানুষ ক্রমশ আশ্বস্ত হচ্ছেন এই ভেবে যে, এবার নিশ্চয় ভূত পালিয়ে বাঁচবে।

পাঁচশো টাকার চুক্তিতে গুনিন ভূত ছাড়াতে এসেছে। এটা তার প্রেস্টিজের লড়াই। অনেক মন্ত্র, গালাগাল, বাক্‌বিতণ্ডার পর ভূত যখন চলে যেতে চাইল, তখন ভূতকে গুনিন নির্দেশ দিল— যাবি যদি প্রমাণ রেখে যা। জলভরা বড়ো পিতলের কলসি রাখা হল গণ্ডির ভিতর নতুন বউয়ের সামনে। গুনিনের নির্দেশে নতুন বউ তখন লিকলিকে শরীরে হাতির মতো বল নিয়ে ভারী কলসিটা দাঁতে কামড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। উপস্থিত জনতার বিস্ময় তখন তুঙ্গে। গুনিনের মন্ত্রের ক্ষমতা আর ভূতের শরীরের তাকত দেখে তারা অভিভূত। এবার ভারী জলভরা কলসিটা দাঁতে করে নিয়ে গণ্ডি ছেড়ে কিছু দূর গিয়ে কাটা কলাগাছের মতো মাটিতে আছড়ে পড়ে জ্ঞান হারাল নতুন বউ। কোলাহল হঠাৎ থেমে গেল। ধরাধরি করে নতুন বউকে নিয়ে ঘরে ঢোকানো হল। গুনিন তার পাওনা বুঝে নিতে তৎপর হয়েছে। জলের ঝাপটা, পাখার বাতাস, হাত-পা মালিশ ইত্যাদি শুশ্রূষার পর নতুন বৌ যখন চোখ মেলে তাকালো, তখন সে আবার আগের নতুন বউ। এলোমেলো বসন নিজেই গুছিয়ে নিতে গিয়ে খানিক লজ্জা। তারপর ভিড় দেখে কৌতূহলী হয়ে ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করে— আমার কী হয়েছিল? ভিড়ের মধ্যে থেকে তাচ্ছিল্যভরা উত্তর আসে— যা খেল দেখালে মা!

সকলেই আশ্বস্ত। যাক বাবা, ভূতের হাত থেকে এতক্ষণে নিস্তার পাওয়া গেল। নতুন বউ ভাবতে পারছে না, সারা গায়ে ব্যথা আর হাতে কালসিটে দাগ কী ভাবে এল। কিছুতেই মনে করতে পারছে না তার ঠিক কী হয়েছিল। কেবল আবছা ভাবে মনে পড়ছে দুপুরের খাওয়ার পর মরা সতীনের কাপড়-চোপড় রাখার বাক্সটা খুলে দেখছিল।

ভূতের ভর না মানসিক রোগ?

সমাজের বেশির ভাগ মানুষ এই ঘটনাকে 'ভূতের ভর' বললেও চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে এটা মানসিক রোগ। সাধারণত দরিদ্র বা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে এই ঘটনা বেশি ঘটে। আবার পুরুষ অপেক্ষা মেয়েদের রোগগ্রস্ত

হতে বেশি দেখা যায়। প্রধানত অশিক্ষা-কুশিক্ষা থেকেই ভূতে ধরার সম্ভাবনা বেশি হয়। তা ছাড়া, নিত্যদিনের অভাব, বঞ্চনা, মন যা চাইছে তা না পাওয়ার বেদনা, অবহেলা, মানসিক অত্যাচার, অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, গুরুত্ব পাওয়ার বাসনা, যৌন আকাঙ্ক্ষার অবদমন, কোনও অন্যায়কে লুকোনোর প্রচেষ্টা, অথবা কারও বিরুদ্ধে জমে থাকা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে গালিগালাজ করতে পারা, ইত্যাদি নানা কারণে মানুষের অবচেতন মন এই রোগের আশ্রয় নেয়। যেহেতু ভরের একটা সমাজস্বীকৃত পরিচয় আছে তাই ভরের মাধ্যমে রাগ, দুঃখ, আবেগ, যন্ত্রণা ইত্যাদির প্রকাশের দ্বারা রোগী তার অবদমিত ইচ্ছাপ্রকাশের সুযোগ পেয়ে যায়, যে ইচ্ছা স্বাভাবিক অবস্থায় তার পক্ষে কোনও ভাবেই পূরণ করা সম্ভব হত না। তবে এর কোনওটাই রোগীর সচেতন ইচ্ছায় ঘটে না। তার অজান্তে অবচেতন মনের প্রভাবেই এই সব ঘটনা ঘটে চলে। ওঝা গুনিনের সঙ্গে ভরে পড়া ব্যক্তির কথোপকথন ও আচরণ দেখে এবং সর্বোপরি একজন রোগা পটকা মানুষ জলভরা ভারী কলসি বা বাটনা বাটা ভারী শিল দাঁতে করে বয়ে নিয়ে যায়— এটা দেখে ভূতের অস্তিত্ব সম্পর্কে গ্রামের মানুষ আরও নিশ্চিত হয়। ব্যাপারটা আশ্চর্য মনে হলেও জেনে রাখা ভালো যে, যে কোনও সুস্থ মানুষই এই ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে পারেন। আসলে ওঝা-গুনিনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ভূতে ধরা ব্যক্তি অবচেতন মনে ঐ প্রাণান্তকর অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার তাগিদ অনুভব করে। আর তার ফলেই ওই রকম প্রায় অসম্ভব কাজও সম্ভব করে ফেলেন। খুব বিপদে পড়লে মানুষ যেমন প্রাণভয়ে অসাধ্য সাধন করে অনেকটা সেই রকম। এই ঘটনাকেই উপস্থিত জনতা প্রেতাত্মার অসীম ক্ষমতা ভেবে ভুল করে।

কখনও কখনও গাছের ডাল ভেঙে প্রেতাত্মা চলে যাওয়ার প্রমাণ রেখে যায় বলে শোনা যায়। যাঁরা এই ডাল ভেঙে যাওয়ার ঘটনার সাক্ষী দেন প্রায় সকলেই এত মোটা আর এত উঁচু গাছের ডালের কথা বলেন যে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে। পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানেই এই ঘটনার সত্যতা প্রকাশ পায়। প্রশ্নের মুখোমুখি হলে সাধারণত তাঁরা বলেন যে, ডাল ভেঙে পড়ছে এরকম দেখিনি। তবে ভেঙে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম, ওটা সদ্য ভেঙে পড়েছিল কারণ ভাঙা অংশটা তখনও কাঁচা ছিল ইত্যাদি। তা হলে উঁচু গাছের ইয়া মোটা ডাল ভেঙে পড়ার কথা যাঁরা বলেন তাঁরা কি মিথ্যা বলেন? সত্যিই তাই। সমাজে মিথ্যা যখন চালু আছে তখন কেউ তো সেটা বলেন। তিনি সাধারণ ব্যক্তি হতে পারেন অথবা হামবড়া, কিংবা কেউকেটাও হতে পারেন। আসলে বিগত দিনের ঘটনাতে 'আমি একমাত্র সাক্ষী' বা 'নিজের চোখে দেখেছি' ইত্যাদি বলার মাধ্যমে তাঁরা সমবেত জনতার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠার লোভ সামলাতে না পেরে অতিরঞ্জিত করে বলে যান। খুঁটিনাটি বিষয়ে প্রশ্নের মুখোমুখি হলে কেবল তখনই মিথ্যার বেলুন চুপসে যায়।

ভূত ও ধর্ম

ভূতে ভরের ঘটনাকে বাস্তবায়িত করতে সমাজে ধর্মীয় কার্যকলাপ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ধর্মগ্রন্থগুলোতে মানুষের আত্মা, পুনর্জন্ম, জন্মান্তর সম্পর্কিত ধ্যান ধারণা এবং আত্মাকে তুষ্ট বা তার মুক্তির নামে শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান, ইত্যাদি কার্যকলাপের দরুণ মানুষ মরে গিয়েও শেষ হয়ে যায় না— এই ধারণা বলবৎ থাকে। এই বিশাল পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন সময়ে মানুষ নিজেদের সমাজ গড়ে তুলেছিল। সে কারণেই বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে আচার-আচরণের এবং চিন্তা-ভাবনার প্রভেদ দেখা যায়। এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের মিল থাকে না। আত্মার প্রসঙ্গে যদি আসি তবে দেখব বৌদ্ধ, ইহুদি ও হিব্রু ধর্মে আত্মা বলে কিছু নেই। অন্যদিকে ইসলাম, খ্রিস্টান ও হিন্দু বা সনাতন ধর্মে মানুষ মরলে তার আত্মার সদ্‌গতি আবশ্যিক কর্ম বলে বিবেচিত হয়। যে আত্মার সদ্‌গতি হয়নি, সে আত্মাই ভূত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করে বলে এই সকল ধর্মের মানুষরা বিশ্বাস করেন। আর সদ্‌গতি প্রাপ্ত আত্মা নরকে বা স্বর্গে যায় কিংবা পুর্নজন্ম লাভ করে। ইসলাম ধর্মে কিন্তু পুনর্জন্ম বলে কিছু নেই। ইসলাম ধর্মে কেয়ামত বা শেষ বিচারের দিন সমস্ত মৃত মানুষ কবর থেকে উঠে আসবে ও দেহ ধারণ করবে। আল্লাহর বিচারের পর দোজখে শাস্তি পাবার পর, অথবা সরাসরি, বেহেস্তে ঠাঁই পাবে। ইসলাম মতে তাই ভূত বলে কিছু নেই। সে কারণে মুসলিম ধর্মের মানুষজন এই রকম অস্বাভাবিক ঘটনাকে ভূতের নয়, জিনের ভর বলে থাকেন। যদিও এই ধরনের ভরের ঘটনাকে যাচাই করলে দেখা যাবে কোনও একজন মৃত মানুষের উল্লেখ সেখানে রয়েছে।

আত্মা সম্পর্কিত এই ধ্যান-ধারণাকে আরও জটিল করে তুলেছে আধুনিক মানুষ। বহু মানুষের গুরুদেব, রামকৃষ্ণের শিষ্য এবং বিবেকানন্দের গুরুভাই বলে পরিচিত স্বামী অভেদানন্দ তাঁর লেখায় আত্মার উপস্থিতি প্রমাণের জন্য এক সূক্ষ্ম যন্ত্রের কথা বলেছেন যার দ্বারা নাকি আত্মার ওজন নির্ধারণ করা যায়। সূক্ষ্ম যন্ত্রটার নাম লেখা না থাকলেও আত্মার উপস্থিতির সপক্ষে নানাবিধ বাক্যবিন্যাস ছাড়াও বাষ্পতুল্য আত্মার ছবি রয়েছে তাঁর লেখা ওই *মরণের পারে* বইটিতে। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ প্রকাশিত এই বইয়ের বক্তব্যকে অস্বীকার করে এমন বুকের পাটা ক'জনের আছে?

বিজ্ঞান কী বলে?

তা হলে সত্যিটা কী? আধুনিক বিজ্ঞান মানুষ বা অন্য প্রাণীর উদ্ভব বা বিকাশ নিয়ে যে সব তথ্য-প্রমাণ হাজির করেছে, তাতে কোথাও এই ধরনের আত্মার অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, আত্মা বা মন হল প্রাণীর মস্তিষ্কের কোষের কার্যকলাপের ফল মাত্র। প্রাণীর মৃত্যু হলে শরীরের অন্যান্য অংশের মতো মস্তিষ্কের কোষেরও মৃত্যু ঘটে। সুতরাং প্রাণীর মৃত্যুর পর মন বা আত্মা বলে কিছু থাকতে পারে না। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যদি বিচার করি তা হলেও মেলে না। যেমন, আত্মা যদি সূক্ষ্ম পদার্থ হয় তবে ভূতে ঠেলা মারে বা ঢেলা ছোঁড়ে কী ভাবে? নাক বা মুখ কোথায় যে নাকি সুরে কথা বলে? আবার দৈনন্দিন আচারের অন্যতম হল পিণ্ডদান। যা কি না শ্রাদ্ধে বা গয়াতে গিয়ে দিতে হয়। এবার ভেবে দেখুন তো মৃত ব্যক্তির আত্মা ওই পিণ্ড খাবে কী করে? তার তো শরীরটাই নেই। প্রথা, ঐতিহ্য এবং ধর্মের নামে শিক্ষিত সমাজেও এই প্রথা উৎসব হিসাবে ঘটা করে পালিত হয়। ব্রাহ্মণদের পেট ভরানো ছাড়া এই উৎসবের অন্য কারণ থাকতে পারে কি? ধর্মবিশ্বাসীরা এবার বলবেন, যে যা বলছে বলুক আমারটাই ঠিক। তাতেও কিন্তু সমাধান হয় না। পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতে বসবাসকারী হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের নিয়মগুলো যদি পাশাপাশি রাখি তবে দেখব একে অপরের বিপরীত আচরণে বিশ্বাসী। হিন্দুধর্মে জন্মান্তর আছে অন্য দিকে ইসলামে মৃত্যুর পর আর জন্ম হয় না। এ ক্ষেত্রে দু'টোই এক সঙ্গে সঠিক হতে পারে

কি? আবার একজন হিন্দু যদি মৃত্যুর ঠিক আগে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন অথবা একজন মুসলমান যদি মৃত্যুর ঠিক আগে হিন্দুত্বকে মেনে নেন, তবে মৃত্যুর পর তাঁর আত্মার কী গতি হবে?

খ্রিস্টমতে শেষ বিচারের দিন বা ইসলাম মতে কেয়ামতের দিন মৃতেরা কবর থেকে জেগে উঠে দেহধারণ করবে মৃত্যুমুহূর্তে যা ছিল সেই অবস্থায়। এবার ভাবুন বিস্ফোরণে, প্লেন বা ট্রেন দুর্ঘটনায় দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যিনি মারা গেছেন, বাঘের পেটে যার জীবনান্ত হয়েছে বা যে শিশুকে অজগর সাপ গিলে খেয়েছে তারা ওই দিন কী অবস্থায় জেগে উঠবে? কিন্তু এই ভাবেই প্রথা, ঐতিহ্য এবং ধর্মবিশ্বাসকে অবলম্বন করে, মৃত্যু ভয়ের তাড়নায় অথবা মানুষের মৃত্যুকে ঘিরে নানা প্রকার আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের মনে ভূত-প্রেত-জিন-আত্মা-ঈশ্বর ইত্যাদির ধারণা যুক্তিবুদ্ধির তোয়াক্কা না করে দীর্ঘদিন বেঁচে আছে।

প্রধানত সমাজের নিম্নশ্রেণির মধ্যে অজ্ঞতা, বঞ্চনা, দারিদ্র্য, অন্ধবিশ্বাস প্রভৃতির প্রভাবে মানসিক ভাবে ভর সংক্রান্ত চিন্তাধারা ছোটোবেলা থেকেই গড়ে ওঠে এবং মানুষ তা সত্যি মনে করে মনের মধ্যে লালন করে। এবার যখন কোনও ব্যক্তির অতৃপ্তি, ক্ষোভ, অবহেলা প্রভৃতি 'ভরে' পড়ার মতো কারণগুলোর সমাবেশ ঘটে তখন ওই ব্যক্তির মধ্যে যা যা প্রতিক্রিয়া দেখা যায় সবই অবচেতন মনের ক্রিয়ার ফল। সে তখন মনের মধ্যে লালিত ভর সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনার শরিক হয়ে নিজের অজান্তেই নিজেকে অন্য কেউ বলে ভাবতে শুরু করে এবং সেই অন্য কেউ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মৃত। আবার যখন ওঝা-গুনিনরা আসে মন্ত্র-দোয়া পাঠ করে তখনও প্রচলিত বিশ্বাসের ফলেই ভূতে ধরা ব্যক্তির অবচেতন মন সায় দেয়। ওঝা-গুনিন এবং ওই রোগীর কথাবার্তা, আচরণ ইত্যাদি একই সামাজিক পরিবেশে থাকার কারণে বেশ মিলে যায়। রোগীও অবচেতন মনে আশ্বস্ত বোধ করে যে এবার ভূত শরীর ছেড়ে পালাবে। এবং শেষ পর্যন্ত রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়লেই এই ঘটনার পরিসমাপ্তি হয়।

সুতরাং বিশ্বাসের ফলে উদ্ভূত সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য ওঝা-গুনিনের কার্যকলাপের মাধ্যমে বিশ্বাসের দ্বারাই নির্মূল হয়। কিন্তু প্রাচীন বিশ্বাসের এই ধারা এখনও কি চলতে দেওয়া যায়? ওঝা, গুনিন, পীর, ফকির, তান্ত্রিক, জ্যোতিষী, বাবাজী, মাতাজী, গুরুজী, পুরুত, ফাদার, ইমাম বা দৈব চিকিৎসকের কাছে গিয়ে তাৎক্ষণিক রেহাই হয়তো মেলে। তবে সেটা সঠিক পদ্ধতি নয়। এ ভাবে হিতে বিপরীতও হতে পারে। কুচিকিৎসার ফলে রোগ জটিল হতে পারে, এমনকী রোগ তাড়াতে গিয়ে রোগীকেই মেরে ফেলাও অসম্ভব নয়। আধুনিক এই সমাজে শরীরের চিকিৎসার পাশাপাশি মনের চিকিৎসাও চলে। কিন্তু মনও যে অসুস্থ হয়, মনেরও যে চিকিৎসার প্রয়োজন আছে, তা সাধারণত ভাবাই হয় না। চিকিৎসা তো দূরের কথা, মনের রোগকে অধিকাংশ সময়ে রোগ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগই থাকে না। আচরণের তারতম্য অনুযায়ী, ভরের কারণ হিসাবে বিভিন্ন প্রকার মানসিক রোগ দায়ী।

এক ধরনের রোগ আছে, যেগুলোকে বলা হয় 'ডিসোসিয়েটিভ ডিসঅর্ডার' (Dissociative Disorder)। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের

চেতনা, স্মৃতি, পরিচয়ের স্বাভাবিক সমন্বয় নষ্ট হয়ে যায়। কোনও এক সামান্য আঘাতে তার হয়তো সাময়িক স্মৃতিভ্রংশ হল— তাকে 'ডিসোসিয়েটিভ অ্যামনেশিয়া' (Dissociative Amnesia) বলে। হঠাৎ কোনও ব্যক্তি সব ভুলে অন্য জায়গায় চলে গেল তাকে 'ডিসোসিয়েটিভ ফুগু' (Dissociative Fugue) বলে। কোনও ব্যক্তি একই সঙ্গে দুই বা তার বেশি পরিচয় গ্রহণ করল তাকে 'ডিসোসিয়েটিভ আইডেন্টিটি ডিসঅর্ডার' (Dissociative Identity Disorder) বলে। এই 'ডিসোসিয়েটিভ ডিসঅর্ডার' গোষ্ঠীর আর একটা রোগ হল 'ডিসোসিয়েটিভ ট্রান্স ডিসঅর্ডার' (Dissociative Trance Disorder)। 'ডিসোসিয়েটিভ ট্রান্স ডিসঅর্ডারে' সাময়িক ভাবে কোনও ব্যক্তির চেতনার পরিবর্তন হয় এবং সে কোনও নতুন পরিচয় গ্রহণ করে। এই রোগে সাধারণ ভাবে তথাকথিত কোনও অলৌকিক শক্তি ওই ব্যক্তিকে আবিষ্ট করে। সেই ব্যক্তি তখন এই শক্তির নির্দেশমতো আচরণ করে। এই শক্তি অশুভ শক্তি যেমন ভূত, জিন হতে পারে আবার শুভ শক্তি যেমন কালী, শিব ইত্যাদি ঠাকুরও হতে পারে। যখন ভর শেষ হয় অর্থাৎ আবিষ্ট দশা শেষ হয়, সাধারণত ওই ব্যক্তি আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে ঘটনাটি ভুলে যান।

আইনের কথা, মানুষের কথা

আমাদের দেশে ১৯৫৪ সাল থেকে The Drug and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act 1954 নামে একটা আইন চালু আছে। যেখানে বলা আছে মন্ত্র-তন্ত্র দোয়া-তাবিজ বা কোনও চমক দেখিয়ে যদি কেউ রোগ সারানোর দাবি করেন, তবে তিনি আইনের চোখে অপরাধী। এই অপরাধের জন্য জেল ও জরিমানার ব্যবস্থাও আছে। তাই প্রতিবাদ করতে হবে ভূত ছাড়ানোর নামে ওঝা-গুনিনদের লোকঠকানো, বিপজ্জনক ও বেআইনি কাজের। মানুষকে ঠকাতে ও খুন করতে এদের উৎসাহ দেবেন না। তবে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ঘটনাও বহু ঘটেছে। অনেক ঠক্‌বাজকে এই দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজব্যবস্থাতেও কিছুদিনের জন্য হলেও জেলে যেতে হয়েছে। বস্তুত যেখানেই এলাকার মানুষ সচেতন হয়েছে, একজোট হয়ে প্রতিবাদ করেছে— সেখানেই এই সমস্ত অনাচার বন্ধ হয়েছে।

লেখক পরিচিতি : অলকেশ মণ্ডল, যুক্তিবাদী আন্দোলনের কর্মী এবং জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত।

স্কিজোফ্রেনিয়া

(পর্ব-২)

সাপলুডো খেলছে সে বিধাতার সঙ্গে, অবিরত। তার কানে কানে কথা বলে শয়তান ও দেবদূত। তার না-বলা শব্দ না-করা কাজ ঈথারে ভেসে ধরা পড়ে বিচিত্র রাডারে। মলিন অবিন্যস্ত সে অসম যুদ্ধ করে চলে অবাস্তব এক অতিবাস্তবতার সঙ্গে, তার কোনও সঙ্গী নেই। এই মানুষের ওলট-পালট করা চিন্তার জগতটাকে স্বাভাবিক করার কোনও গ্যারান্টি নেই, কিন্তু তার নিজের মধ্যেকার প্রবল আলোড়নটাকে যাতে সে সামলাতে পারে সেজন্য আমাদের মানবিক বোধ বড়ো দরকার— লিখছেন **ডা. সুমিত দাশ।**

আমি তখন সদ্য পাশ করে সাইকিয়াট্রিস্ট হয়েছি। আমার এক ডাক্তার বন্ধু বলল যে, আমাদের পাড়ার রাস্তা ঘাটে ঘুরে বেড়ানো 'পাগল'-টাকে সারাতে পারলে সে আমার সাইক্রিয়াট্রি বিষয়টাকে বিশ্বাস করবে। আমি কোনও জবাব দিইনি। আমি বলিনি ও কত দিনের মানসিক রোগী, আগে চিকিৎসা হয়েছে কি না, এখন ওকে দায়িত্ব নিয়ে কেউ চিকিৎসা করাবে কি না ইত্যাদি অনেক বিষয়ের উপর একটা চিকিৎসা নির্ভর করে। ডাক্তার হিসাবে তারও অজানা ছিল না অন্যান্য রোগ যেমন ডায়াবেটিস, হাঁপানি, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদির চিকিৎসাও এ সব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু মানসিক রোগের ক্ষেত্রে সব কিছু অন্য ভাবে দেখার সেই পুরানো অভ্যাস— যেখানে ডাক্তার-অডাক্তার সবাই সমান। এই সচেতনতার অভাব প্রায় গোটা বিশ্ব জুড়ে। অথচ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সমীক্ষায় উঠে এসেছে এই বিশ্বের প্রথম দশটা সব থেকে ভয়ঙ্কর রোগের মধ্যে পাঁচটা হচ্ছে মানসিক রোগ। আর এই পাঁচটার অন্যতম রোগ হচ্ছে স্কিজোফ্রেনিয়া। এখন দেখে নেওয়া যাক সারা বিশ্বে এই রোগের প্রকোপের চিত্রটা কী রকম।

রোগের বিদ্যমানতার ধরন

বিভিন্ন সমীক্ষার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোনও জনগোষ্ঠীতে স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা প্রতি ১০০০ জন মানুষে ২.১-৭ জন— একে বলা হয় পয়েন্ট প্রিভ্যালেন্স (Point Prevalence)। যাঁদের উপসর্গ বর্তমানে নেই কিন্তু আগে রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন, তারা এই সমীক্ষা থেকে বাদ যায়। তাই আর এক রকম সমীক্ষা আছে যাকে বলে লাইফ টাইম প্রিভ্যালেন্স (Lifetime Prevalance), অর্থাৎ বর্তমানে সুস্থ থাকলেও আগে রোগটা হয়েছিল কি না, তার হিসাবও এখানে ধরা হয়। তখন দেখা যায় সংখ্যাটি প্রতি ১০০০ জন মানুষে ১৫ থেকে ১৯ জন। অপর একটা সমীক্ষা যাকে ইন্সিডেন্স বলে, তাতে সারা বছরে কতজন নতুন মানুষ রোগাক্রান্ত হলেন তার হিসাব নেওয়া হয়। দেখা গেছে তার সংখ্যা প্রতি ১০,০০০ লোকে ০.৫ থেকে ৫ জন। যদিও সারা বিশ্বে স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের মোটামুটি এই চিত্রটা বিদ্যমান কিন্তু দেশ ভেদে কিছু হেরফের হয়। যেমন সুইডেন, ফিনল্যান্ড এবং পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় কিছু দ্বীপে স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের হার খুব বেশি কিন্তু সাউথ ডাকোটার কিছু অংশে স্কিজোফ্রেনিয়া রোগ প্রায় নেই কিন্তু ডিপ্রেশানের হার খুব বেশি।

স্কিজোফ্রেনিয়া শিশু থেকে বয়স্ক যে কোনও মানুষেরই হতে পারে, কিন্তু ১০ বছরের আগে এবং ৬০ বছরের পরে এ রোগ সাধারণত দেখা যায় না। পুরুষ মানুষের ক্ষেত্রে ১০ থেকে ২৫ বছরে সব থেকে বেশি এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ২৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সে এই রোগ বেশি হয়। স্কিজোফ্রেনিয়া লিঙ্গ নিরপেক্ষ অর্থাৎ পুরুষ ও মহিলাদের সমান হারে আক্রমণ করে। আর একটা পর্যবেক্ষণ হচ্ছে ১০ লাখের বেশি জনসংখ্যা যে সব শহরে সেখানে এই রোগ বেশি হয় কিন্তু ১০ হাজারের কম জন সংখ্যা যে শহরে সেখানে এই রোগ প্রায় নেই।

স্কিজোফ্রেনিয়া রোগীর মধ্যে দুর্ঘটনা বা অন্যান্য শারীরিক রোগে মৃত্যুহার অনেক বেশি। এর কারণ রোগীর শারীরিক রোগকে গুরুত্ব না দেওয়া। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে শতকরা প্রায় আশিভাগ রোগীর অন্য কোনও শারীরিক রোগ আছে কিন্তু শতকরা পঞ্চাশ ভাগ রোগ ঠিকমতো নির্ণয় হয় না। আর একটা আকর্ষণীয় তথ্য হচ্ছে, একটা বড় অংশ রোগীর জন্ম হচ্ছে শীতকাল বা বসন্তের শুরুতে। এর সঠিক কারণ বোঝা যায়নি, তবে এই সময়ে সক্রিয় হয়ে ওঠা কোনও ভাইরাসের কারণে এটা হতে পারে। স্কিজোফ্রেনিয়া রোগীদের মধ্যে নেশা করার প্রবণতা অনেক বেশি। শতকরা পঞ্চাশ ভাগ রোগী নেশা করেন। এছাড়া যারা গাঁজা খান তাদের স্কিজোফ্রেনিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

যেহেতু রোগটা একটা মানুষের জীবনের শুরুর দিকে আক্রমণ করে তাই ভর্তি করে বা বাড়িতে রেখে চিকিৎসার খরচ অনেক বেশি। স্কিজোফ্রেনিয়া

এবং অন্যান্য কয়েকটা মানসিক রোগী যাদের ভর্তি করে চিকিৎসা করতে হয় এবং পরবর্তীকালে ওষুধ এবং অন্যান্য সাহায্যকারী সংস্থার খরচ আমেরিকাতে সব রকমের ক্যানসারের চিকিৎসার খরচের থেকে বেশি। অন্যান্য দেশের ছবিটাও মোটামুটি একই রকম।

কী ভাবে রোগটা চেনা যায়?

রোগটা পুরোপুরি প্রকাশ পাওয়ার আগে থেকেই মানুষটার চরিত্রে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়া যেতে পারে। যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে ছোটবেলাতে ওই ব্যক্তি একা থাকতে ভালবাসতেন, বিশেষ বন্ধুবান্ধব ছিল না। একা একা গান শোনা, টি.ভি. দেখা এসব তাঁর পছন্দের বিষয়, এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে যাওয়া পছন্দ নয়। তবে ওইগুলো থাকলে তার পরবর্তীকালে স্কিজোফ্রেনিয়া হবেই এরকম কোনও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। কিছু ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ধর্মীয় ভাব, অবাস্তব দার্শনিক চিন্তা অথবা মাথা ব্যথা, হাত-পা ব্যথার মতো শারীরিক উপসর্গ দিয়ে রোগের সূত্রপাত হয়।

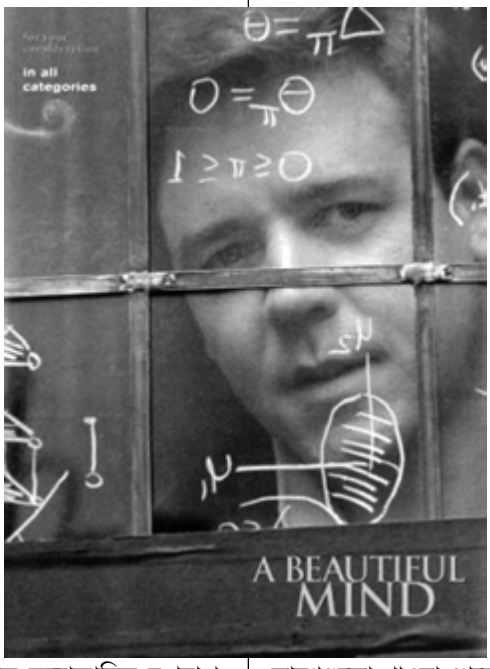

রোগটা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পেলে মানুষটা প্রায় পরিবর্তিত একটা মানুষে পরিণত হন। তাঁর পোশাক আশাক অবিন্যস্ত থাকে, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর থাকে না— তবে কিছু ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক ভাবে নিখুঁত সাজগোজ করে। কেউ কেউ বিরক্ত ও চঞ্চল থাকেন, মাঝে মধ্যে হিংস্র আচরণও করে ফেলেন। আবার অনেকে অস্বাভাবিক চুপচাপ থাকেন–একই ভঙ্গিমায় ঘণ্টার পর ঘ ণ্টা দাঁড়িয়ে বা বসে থাকেন। অনেকে মুখ বিকৃত করে, এক বিশেষ ভঙ্গিমায় হাত পা নাড়েন বা একই কথা বার বার বলেন।

স্কিজোফ্রেনিয়াকে মূলত চিন্তার রোগ বলা হয়। অর্থাৎ চিন্তার জগৎটা ওলোট পালোট হয়ে যায়। আক্রান্ত ব্যক্তি নানারকম ভ্রান্তি বা ডেলিউশানে ভোগে। ভ্রান্তি বলতে বোঝায় একটা নির্দিষ্ট, দৃঢ় কিন্তু অযৌক্তিক বিশ্বাস যার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই; রোগীকে যুক্তি দিয়ে যেটা বোঝানো যাবে না। যেমন কোনও কারণ ছাড়াই রোগী মনে করতে পারে লোকে তাঁকে নিয়ে আলোচনা করছে বা তাঁর ক্ষতি করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। কেউ বলেন তাঁর চিন্তা এবং কাজকর্মকে অন্য কোনও শক্তি নিয়ন্ত্রণ করছে, তাই তার নিজস্ব কোনও কিছু করার উপায় নেই। আবার অনেকে উল্টোটা বলেন, অর্থাৎ তিনি অন্যকে বা চাঁদ সূর্যকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। কারও মনে হয় রেডিও টিভিতে তাঁকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। অনেকে রাস্তাঘাট থেকে জিনিসপত্র কুড়িয়ে আনেন। যেহেতু কথাকে চিন্তার ধ্বনিরূপ বলা যায় তাই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর কথাবার্তার ব্যাপক পরিবর্তন হয়। একটা কথার উত্তর দিতে গিয়ে অন্য প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করে অথবা এক প্রসঙ্গ একটু ছুঁয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে যান। অনেক নতুন শব্দ আবিষ্কার করেন যেগুলো কোনও শব্দ ভাণ্ডারে নেই। অনেকে কথা বলতে গিয়ে কীসে যেন বাধা পেয়ে আটকে যান। অনেকের মনে হয় যা ভাবছেন তা তাঁর মাথা থেকে ভেসে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং অন্যরা বুঝে ফেলছেন তিনি।

স্কিজোফ্রেনিয়া রোগে আর একটা প্রধান উপসর্গ হচ্ছে অলীক অনুভূতি বা হ্যালিউসিনেশান (Hallucination) —বাইরের কোনও উদ্দীপনা ছাড়াই যে অনুভূতি হয় তাকে অলীক অনুভূতি বলে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যে কোনটাতেই এই অনুভূতি হতে পারে, তবে সব থেকে বেশি হয় শ্রবণ অলীক অনুভূতি বা অডিটরি হ্যালিউসিনেশান (Auditory Halluciation)।

আক্রান্ত মানুষটার মনে হয় তাঁর কানে কানে এক বা একাধিক মানুষ কথা বলছেন। অনেক সময় এই গলাগুলো তাঁকে ভয় দেখায়, তাঁর নামে খারাপ কথা বলে বা কখনও কখনও হাসির কথাও বলে। স্কিজোফ্রেনিয়া রোগী আপন মনে বিড়বিড় করেন আসলে তিনি এই অলীক শ্রবণের উত্তর দেয়। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর মনে হয় তাঁর প্রতিটা কাজকে ধারাবিবরণীর মতো বলে যাচ্ছেন এই অদেখা মানুষগুলো।

রোগের কারণ

কোনও একটা কারণে রোগটা হয় না বা ওই কারণটা থাকলে রোগটা হবেই এরকম সরলীকরণ কিছু নেই। তবু রোগটার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে কারণগুলো পাওয়া গেছে সেগুলো একটু দেখে নেওয়া যাক।

আর পাঁচটা রোগের মতো এখানেও জিনের ভূমিকা আছে। তবে একটা নির্দিষ্ট জিন নয়। অনেকগুলো জিনের সম্মিলিত উপস্থিতির প্রভাবে স্কিজোফ্রেনিয়া হবার সম্ভাবনা বাড়ে। বাবা বা মায়ের একজনের এই রোগ থাকলে ১২ শতাংশ এবং বাবা-মা দু'জনের এই রোগ থাকলে ৪০ শতাংশ সন্তানের স্কিজোফ্রেনিয়া হয়। জিনগত কারণের সঙ্গে পরিবেশগত চাপ অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবনে বা সামাজিক কারণে কোনও মানসিক চাপ হলে এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। জিনগত প্রভাব না থাকলেও যে কোনও ষাটোর্ধ পিতার সন্তানের স্কিজোফ্রেনিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

মস্তিষ্কের বিভিন্ন রকম রাসায়নিক পদার্থ মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে। এগুলোর মধ্যে ডোপামিন একটা উল্লেখযোগ্য পদার্থ। স্কিজোফ্রেনিয়া রোগীদের মস্তিষ্কে ডোপামিনের আধিক্য দেখা যায়।

একটা সময়ে স্কিজোফ্রেনিয়া ও অন্যান্য মানসিক রোগের কোনও ওষুধ ছিল না। তখন মনের গঠন ও তার ক্রিয়াকলাপ অর্থাৎ মনোগতি-বিদ্যা দিয়ে সমস্ত রোগের ব্যাখ্যা ও চিকিৎসা করা হত। আর এ ব্যাপারে ফ্রয়েড সাহেবকে স্মরণ না করে উপায় নেই। তাঁর মতে, বয়স

বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন একটা স্তর থেকে আর এক স্তরে উন্নীত হয়। কিন্তু নানা কারণে মন যখন শৈশবের স্তরে ফিরে যায় তখন স্কিজোফ্রেনিয়া রোগ হয়। তবে এই তত্ত্ব নিয়ে প্রচুর বিতর্ক আছে। কিছু কিছু পারিবারিক পরিস্থিতিতে এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

যে সব পরিবারে বাচ্চারা কোনও একটা বিষয়ে বাবা এবং মায়ের থেকে বিপরীতধর্মী নির্দেশ পায় সেখানে এই সমস্যা হতে পারে। বিপরীত লিঙ্গের বাচ্চার প্রতি বাবা-মায়ের এক জনের অতিরিক্ত নৈকট্য এই সমস্যা করতে পারে। কোনও কোনও পরিবারে বাবা-মায়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে একে অপরকে বশে রাখার জন্য। কোথাও আবার রাগ, দুঃখ এসব আবেগকে জোর করে অবদমিত রাখা হয়। তার ফলশ্রুতিতে নিজেদের মধ্যে আপাত সুসম্পর্ক রাখতে বাবা-মা বিশেষ ধরনের ভাষার ব্যবহার করে। বাচ্চারা সেই সব ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে পরবর্তী কালে বাইরের জগতে বেরিয়ে অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে মানসিক চাপে পড়ে যায়। এই সব পরিবারের বাচ্চাদের পরবর্তীকালে স্কিজোফ্রেনিয়া হতে পারে। তবে কখনই সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না এই রকম পারিবারিক অবস্থাতে স্কিজোফ্রেনিয়া হবেই।

রোগের ভবিষ্যৎ

বিভিন্ন সমীক্ষায় জানা গেছে প্রথমবার রোগ আক্রমণের ৫ থেকে ১০ বছর পর ১০-২০ শতাংশ রোগী ভাল থাকে। বাকিদের রোগের উপসর্গ বারবার ফিরে আসে, হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। সামগ্রিক বিচারে বলা যায় আক্রান্ত রোগীদের ২০-৩০ শতাংশ মোটামুটি স্বাভাবিক জীবন যাপন করে। শতকরা প্রায় ২০-৩০ ভাগ রোগীর কিছু উপসর্গ থেকেই যায়। বাকি ৪০-৬০ শতাংশ রোগীর সারা জীবনের জন্যে অনেক উপসর্গ থেকে যায় এবং তার জীবনটাই বিপর্যস্ত থাকে।

চিকিৎসা

এই রোগের চিকিৎসা মূলত ওষুধ দিয়ে করা হয়। আগেকার দিনের ওষুধগুলোর পার্শ্বক্রিয়া অনেক বেশি ছিল কিন্তু আধুনিক ওষুধগুলোর পার্শ্বক্রিয়া অনেক কম। সাধারণ মানুষের একটা ধারণা আছে এই ওষুধগুলো শুধু ঘুম পাড়িয়ে রাখে, এবং হার্ট, লাংস, কিডনি, লিভার প্রভৃতি প্রত্যঙ্গ খারাপ করে দেয়। এটা ভুল ধারণা। তবে কোনও কারণে ওই সব দেহযন্ত্রের রোগ হলে ওষুধের মাত্রা কমিয়ে দিতে হয়।

শুধুমাত্র ওষুধ দিয়ে এই রোগের চিকিৎসা করা যায় না। রোগীকে তার ক্ষমতা ও দক্ষতা অনুযায়ী কোনও কাজে যুক্ত করতে পারলে তাঁর ভবিষ্যৎ ভালো হয়।

এছাড়া আর একটা বিষয়ে ট্রেনিং-এর প্রয়োজন আছে। রোগের কারণে রোগীদের কিছু সামাজিক সমস্যা থাকে, যেমন এঁরা একজন মানুষের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারেন না। সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে স্বাভাবিক মেলামেশা করতে পারেন না। কাউন্সেলিং এবং আচরণ পরিবর্তনের শিক্ষার মাধ্যমে এগুলোর উন্নতি করা যায়। তাতে রোগীরা অন্যদের সঙ্গে সামাজিক ভাবে যুক্ত হতে পারেন। রোগীর পরিবারকেও কতগুলি বিষয়ে শিক্ষিত করতে হবে। রোগের উপসর্গ প্রাথমিক স্তরে চেনার উপায় এবং পারিবারিক কোন পরিস্থিতি রোগ শুরু করে সেগুলো খেয়াল রাখতে হবে। ফলে তাঁরা দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে পারেন এবং বিশেষ পরিস্থিতিগুলো এড়িয়ে যেতে পারেন।

সামগ্রিকভাবে স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের বর্তমান অবস্থা খুব আশাব্যঞ্জক নয়। তবে নতুন নতুন গবেষণায় নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কার হচ্ছে এবং অনেক নতুন চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভব হচ্ছে। তাই অদূর ভবিষ্যতে আশা করা যায়, এই রোগীদের জীবনে নতুন দিগন্ত খুলে যাবে।

লেখক পরিচিতি : ডা. সুমিত দাশ, এমবিবিএস, ডিপিএম, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। যুক্ত আছেন কম খরচে যুক্তিসঙ্গত চিকিৎসার এক ক্লিনিকে। জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মী।

ADVERTISEMENT

অনীক

'অনীক' পত্রিকা ৫০ বছরে পা দিয়েছে। এই দীর্ঘ সময় ধরে অনীক চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। 'অনীক'-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোলনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে— রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)

অনীক, প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯।

ফোন : ৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

বিস্থাপন ও মূলবাসীদের স্বাস্থ্য সমস্যা

এই দেশটার মধ্যে আর একটা দেশ আছে। সে দেশটাকে আমরা চিনি না। সেই দেশটার নাম কখনও জাদুগোড়া, কখনও মানিবেলি। সেই দেশের মানুষগুলো জানতেও পারে না যে তাদের চেনা-নাম দেশের বাইরে একটা রাঁচি বা দিল্লি আছে, একটা গান্ধীনগর আছে, একটা গণতন্ত্র আছে। অথচ সেই রাঁচি-গান্ধীনগর-দিল্লি তাদের জমি খুঁড়ে ইউরেনিয়াম তোলে, তাদের বাড়ি ডুবিয়ে সর্দার সরোবর বাঁধ তৈরি করে।

আমাদের উন্নয়ন হয়। তা হোক, আমরা একবার শুধু চোখ মেলে দেখি আমাদের উন্নয়নের মূল্য চোকাতে অন্য ভারতের মানুষদের স্বাস্থ্য কী ভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। লিখেছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ**।

যে সব কারণে মানুষ নিজের বাসভূমি থেকে উৎখাত হন, সেগুলো হল শিল্পোদ্যোগ, বাঁধ, রাস্তা, খনি, বিদ্যুৎ প্রকল্প, নতুন নতুন শহর ইত্যাদি। ১৯৫৫ থেকে ১৯৯০, এই সময়কালে আমাদের দেশে উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বিস্থাপিত হয়েছেন প্রায় ২ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ। আর ২০০৭-এ মোট বিস্থাপিতের সংখ্যা ২ কোটি ১৩ লক্ষ অর্থাৎ ১৯৫৫ থেকে ১৯৯০, এই ৩৫ বছরে যত জন বিস্থাপিত হয়েছিলেন তার চেয়ে বেশি বিস্থাপিত হয়েছেন এই বছরে। এই ২ কোটি ১৩ লক্ষ বিস্থাপিতের মধ্যে বাঁধের কারণে বিস্থাপিত ১ কোটি ৬৪ লক্ষ, খনির জন্য ২৫ লক্ষ ৫০ হাজার, শিল্প-কারখানার জন্য ১২ লক্ষ ৫০ হাজার আর অভয়ারণ্য ও জাতীয় পার্কের নামে ৬ লক্ষ। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, উন্নয়নের নামে বিস্থাপিতদের ৪০ শতাংশেরও বেশি আদিবাসী মানুষ, যদিও ভারতের জনসংখ্যার মোটামুটি ৮.২ শতাংশ হল আদিবাসী।

নিজভূমি থেকে উৎখাত হওয়া এই মানুষেরা যেন শরণার্থী— বাঁধ, জলাশয় বা রাজপথ যাঁদের বিস্থাপিত করেছে। এই অবস্থাটা কেবল তাঁদের জীবনে দুঃখজনক ও হঠাৎ করে বিপর্যয় ডেকে আনে তাই নয়, বিস্থাপন তাঁদের দরিদ্রতর করে, অর্থনৈতিক ভাবে ঝুঁকির মুখোমুখি করে, সামাজিক ভাবে ধ্বংস করে।

বিস্থাপনের সঙ্গে সম্পর্কিত পরস্পর-জড়িত কতকগুলো ঝুঁকি হল— ভূমিহীনতা, কর্মহীনতা, বাসস্থানের অভাব, প্রান্তিক হয়ে যাওয়া, খাদ্যের অভাব, রোগ ও মৃত্যুর হার বৃদ্ধি, সামূহিক সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়া, সামাজিক অবক্ষয়, সামাজিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হওয়া, মানবাধিকার লঙ্ঘন।

বিস্থাপন বিস্থাপিতদের সামাজিক চাপ ও মানসিক আঘাতের শিকার করে তোলে। বিস্থাপিতরা যেখানে পুনর্বাসিত হন, সেখানকার পরিবেশের কারণে তাঁরা রোগাক্রান্ত হন, বিশেষত ম্যালেরিয়ার মতো পরজীবীঘটিত ও পতঙ্গবাহিত রোগে।

নিরাপদ পানীয় জল ও নিকাশী ব্যবস্থার অভাবে দীর্ঘস্থায়ী ডায়েরিয়া, আমাশার মতো মহামারীর ঝুঁকি থেকে যায়। সমস্ত শরণার্থীদের মধ্যে আবার নবজাত, শিশু ও বৃদ্ধদের রোগাক্রান্ত হওয়ার ও মৃত্যুর ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গে আসি

স্বাস্থ্য কেবল রোগ বা পঙ্গুত্ব না থাকা নয়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ভাবে ভালো থাকাই হলো সুস্বাস্থ্য।

আসুন দেখি, কতটা সুস্থ আমাদের দেশের আদিবাসীরা। আমাদের কথা নয়, যোজনা কমিশনের দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০০২-২০০৭) থেকে উদ্ধৃত করছি — 'আদিবাসীদের মধ্যে বিশেষত তাঁদের শিশু ও মহিলাদের মধ্যে অপুষ্টির প্রাবল্য দেখা যায়, যার ফলে তাঁরা শারীরিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন, তাঁদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, অনেক সময় মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি হয়। বেশির ভাগ আদিবাসী মহিলা রক্তাল্পতায় ভোগার জন্য ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা কিছুদিন ছাড়া সন্তানের জন্ম দেন তাঁদের কর্মক্ষমতা প্রভাবিত হয় ও রোগাক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। আদিবাসী মহিলাদের পুষ্টির অবস্থা তাঁদের জনস্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে ও তাঁদের বাচ্চাদের জন্মের সময়কার ওজন কম হয়— এর ফলে বাচ্চাদের

বেঁচে থাকার সম্ভাবনা, বৃদ্ধি ও বিকাশ প্রভাবিত হয়। দেখা যায় আদিবাসীদের খাদ্য তালিকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন-এ ও সি, রাইবোফ্ল্যাভিন ও প্রাণীজ প্রোটিন কম থাকে।

আদিবাসী মা ও শিশুরা কেমন আছেন, বোঝা যাবে নীচের সারণি থেকে। সারণির তথ্যগুলো জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা ২ ও ৩ থেকে সংগৃহীত।

সূচক	আদিবাসী NFHS-2	আদিবাসী NFHS-3	অ-আদিবাসী NFHS-3
বিবাহের সময় গড় বয়স (বছরে)	১৫.৮	১৬.৩	১৮.১
বিবাহের আইনি বয়স সম্পর্কে সচেতনতা (শতাংশ)	৭.৫		২২
উর্বরতার হার	৩.০৬	৩.১২	২.৬৮
প্রথম সন্তান জন্মের সময় গড় বয়স (বছরে)	১৮.৮	১৯.১	২০.৬
যাঁরা গর্ভাবস্থায় কোনও প্রসব-পূর্ব যত্ন পাননি, তাঁদের অনুপাত (শতাংশ)	৪৩.১	৩৭.৮	২২.৮
ঘরে প্রসব (শতাংশ)	৮১.৮	৮২.৩	৪৯
প্রতি ১০০০ জীবিত শিশুজন্মে মৃত্যুর হার	৮৪.২	৬২.১	৫৭
কত মাস কেবল বুকের দুধ খাওয়ানো হয়?	২.৯	৩.১	১.৯
সমস্ত প্রাথমিক টিকা নেওয়া আছে (শতাংশ)	২.৬৩	১.৩৫	৩.৮
কোনও টিকা নেওয়া নেই (শতাংশ)		১১.৫	৪.৩

ছত্তিশগড়

আদিবাসীদের স্বাস্থ্য ও বি-স্থাপনের সম্পর্ক বুঝতে আসুন আমরা ছত্তিশগড়ের দিকে চোখ ফেরাই। ২০০০ সালে মধ্যপ্রদেশ থেকে সৃষ্ট ছত্তিশগড়, সেই রাজ্য মধ্যভারতে যে রাজ্যে আদিবাসী জনসংখ্যার অনুপাত সবচেয়ে বেশি।

জনসংখ্যার ৩১.৮ শতাংশ হলেন আদিবাসীরা, ১১.৬ শতাংশ মানুষ তপশিলি জাতির। ভারতের মোট ভূমির ২১ শতাংশ বনাঞ্চল, ছত্তিশগড়ের ৪৪ শতাংশ ভূমি বনের। আদিবাসীদের অধিকাংশের বাস বনাঞ্চলে অবস্থিত গ্রামগুলোতে। খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ রাজ্য ছত্তিশগড়। আছে লৌহ আকর, বক্সাইট, চুনাপাথর। এ ভারতের একমাত্র রাজ্য, যেখানে টিনের আকর পাওয়া যায়। সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে সোনা, হিরে ও কোরান্ডামের ভাণ্ডার। এই খনিজ সম্পদগুলোর অধিকাংশই রয়েছে বনাঞ্চলে। খনি খোলা মানে বন কাটা, বন-গ্রাম থেকে আদিবাসীদের উৎখাত করা।

ছত্তিশগড়ের সবচেয়ে বড়ো শিল্পোদ্যোগ ছিল ভিলাই ইস্পাত কারখানা। ১৯৯০-এর দশক থেকে শিল্পায়নের বন্যা এসেছে। সম্প্রতি সরকার ৬০টি-র বেশি কয়লা-ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র খোলার উদ্যোগ নিয়েছে, যাতে উৎপন্ন হবে ৫০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ, যদিও রাজ্যে প্রয়োজন মাত্র ৫,০০০ মেগাওয়াট। ৪০টির-ও বেশি ইস্পাত কারখানা খোলার কাজ চলছে, স্থাপিত হচ্ছে বড়ো বড়ো সিমেন্ট কারখানা। কারখানার জন্য, কারখানার কাঁচামাল জোগাতে আদিবাসীরা উৎখাত হচ্ছেন। নদ-নদীগুলোর জল আদিবাসীদের সেচের কাজে না লেগে তৃষ্ণা মেটাচ্ছে কারখানাগুলোর।

আসুন আমরা দেখি—ছত্তিশগড়ের আদিবাসীরা কেমন আছেন।

প্রধান স্বাস্থ্য-সূচকগুলো

স্বাস্থ্যসূচক	ছত্তিশগড়	ভারত
জন্মহার	২৫.২	২৫.০
মৃত্যুর হার	৮.৫	৮.১
নবজাতকের মৃত্যু হার	৭০	৬৩
জন্মের সময় আনুমানিক আয়ু (১৯৯১)	৬১.৪	৫৭.৩
মায়েদের মৃত্যুর অনুপাত	৪৯৮	৪০৬

ছত্তিশগড়ের আদিবাসীদের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের আদিবাসীদের স্বাস্থ্য-সূচকের তুলনা আমরা এখনও জোগাড় করতে পারিনি, জোগাড় করতে পারিনি ছত্তিশগড়ের আদিবাসীদের সঙ্গে সে রাজ্যের অ-আদিবাসীদের

তুলনা। কিন্তু ছত্তিশগঢ়ের জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আদিবাসী ও সারা ভারতের মাত্র সাড়ে বারো ভাগের এক ভাগ আদিবাসী হওয়ায় আশা করি সংগৃহীত তথ্যে আদিবাসী ও অ-আদিবাসীদের ফারাক বোঝাতে পারব।

সুস্থ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাগুলো ছত্তিশগঢ়ের মানুষ কেমন পান দেখি। তার সঙ্গে নীচের সারণিতে গ্রাম ও শহরের ফারাকও দেখতে পাব। আদিবাসীদের অধিকাংশ গ্রামে থাকেন।

বুনিয়াদি সুবিধা	সব মিলিয়ে (শতাংশ)	গ্রামে (শতাংশ)	শহরে (শতাংশ)
বিদ্যুৎ পান	৩১.৮%	২৫.৪%	৬১.৪২%
নিরাপদ পানীয় জল পান	৫১.২%	৪৫.১%	৭৯.৬%
শৌচাগার	১০.৩%	৩.৩%	৪২.৪%
তিনটে সুবিধাই পান	৭.৬%	১.৫%	৩৫.৬%
কোনটাই পান না	৩৬.১%	৪১.৯%	৯.৬%

National Family Health Survey II, 1998-99 & District Level Household Survey, RCH, 2002-03 থেকে পাওয়া তথ্যগুলো দেখুন—

	ছত্তিশগঢ়	ভারত
যে সব গর্ভবতী মহিলা গর্ভাবস্থায় যত্ন (Anti-Natal Care)		
পেয়েছেন তাঁদের শতকরা হার	৪১.৭	৭৩.৪
কত শতাংশ প্রসব হাসপাতালে হয়েছে	২০.২	৪০.৫
কত শতাংশ শিশু টিকা পেয়েছে	২১.৮	৪২.০
এক বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুর হার	৮০.৯	৬৭.৬
পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুর হার	১২২.৭	৯৪.৯

আমি যে পরিসংখ্যান তুলে ধরলাম তা ছত্তিশগঢ়ের, স্বাভাবিক সময়ের, অপারেশন গ্রিন হান্টের আগেকার। আজ আদিবাসীরা বিস্থাপনের ফলে কেমন আছেন জানতে আমাদের সালওয়া জুডুম-এর শরণার্থী শিবিরগুলোতে আদিবাসীদের অবস্থা জানতে হবে, যা জানা অসম্ভব।

আমি বলতে চাই আদিবাসীরা ভালো নেই। তাঁরা ভালো নেই, কেন না তাঁরা তাঁদের জল-জঙ্গল-জমি থেকে বিস্থাপিত হচ্ছেন প্রতিনিয়ত। আদিবাসী এলাকায় মোবাইল চিকিৎসা ক্লিনিক পাঠিয়ে নয়, তাঁদের সুস্থ রাখতে পারে কেবল জল-জঙ্গল-জমির উপর তাঁদের অধিকার।

লেখক পরিচিতি : ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এমবিবিএস, হাওড়ায় শ্রমজীবী মানুষের জন্য গড়ে তোলা এক ক্লিনিকে পূর্ণ সময়ের চিকিৎসক, ও *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র সম্পাদক।

ADVERTISEMENT

Acne, Hair Fall,Vitiligo – Do **NOT** Despair.
All are Treatable.
Consult your Dermatologist

ALKEM
Derma Care
Adding Value to Skin Care

A Division of **Alkem** Laboratories Ltd

জাদুগোড়া—উন্নয়নের মূল্য চোকাবে কে?

জাদুগোড়া। ঝাড়খণ্ডের এক ঘুমন্ত আধা শহর। আর পাঁচটা আধা-শহরের মতোই জাদুগোড়া ছিল তার খেত-খামার গরু-ছাগল ঝগড়া-কোঁদল নিয়ে। কিন্তু ইউরেনিয়ামের খনি পাওয়া গেল সেখানে আর উন্নয়নের দৃষ্টিপাতে বদলে যেতে লাগল সে। কেমন আছে জাদুগোড়া? কেমনভাবে সেখানকার মানুষ ইউরেনিয়াম খনির প্রবল তেজস্ক্রিয়তার সঙ্গে বাস করছেন? উন্নয়নের মাসুল দিতে গিয়ে তাঁদের কোনও ক্ষতি হচ্ছে না তো? দেখে এলেন **ঈপ্সিতা পাল ভৌমিক।**

জাদুগোড়া। জায়গাটার নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। সেই ছোটো-বেলায় ভূগোল বইয়ের দৌলতে। আমাদের দেশের তখনকার সবেধন ইউরেনিয়াম খনি, দেশের পরমাণু অস্ত্র ও বিদ্যুতের কাঁচামালের জোগানদার, দেশের সম্পদ, গর্ব ইত্যাদি ইত্যাদি। জাদুগোড়ার সঙ্গে এর পরের মোলাকাত অনেক দিন পরে, সেও অবশ্য বছর ১৩-১৪ হবে, সেটা আর আগের মতন তেমন মধুর হল না। বলা যেতে পারে রীতিমতন শকিং হল। হবে না? নিজেরা যখন গবেষণা করতে গিয়ে রীতিমতন ক্লাস করে শিখছি গবেষণাগারে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করলে কী রকম একসে বড়কর এক সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, হাতে আলাদা দস্তানা, তার আলাদা ব্যবহার থেকে শুরু করে আলাদা অ্যাপ্রন, তাকে আলাদা ভাবে রাখা, পরীক্ষার শেষে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ফেলার জন্যও একের পর এক নিয়ম, বিকিরণের কাউন্ট বিপদসীমার নীচে নামছে কী না, তা বিকিরণ কাউন্টার যন্ত্রে বারংবার চেক করা। হ্যাঁ, বাড়াবাড়ি রকমের সাবধানতা। কিন্তু না, সাবধানতার বাড়াবাড়ি কখনই নয়, কারণ বিষয়টা তেজস্ক্রিয়তা। যার কণামাত্র অবশেষ, একটুকু ছোঁওয়া 'স্লো পয়জন' হয়ে ঢুকে তিলে তিলে মেরে ফেলতে পারে, জন্ম দিতে পারে নানাবিধ অসুস্থতার, জন্ম দিতে পারে একটা অসুস্থ প্রজন্মের।

তথ্যচিত্রে বিচিত্র তথ্য

তো, যেখানে তেজস্ক্রিয়-তার বহর অনেক বেশি, সেই জাদুগোড়ায় যখন দেখি মানুষজন সেই তেজস্ক্রিয় জিনিসপত্তর দিব্বি নির্বিকারচিত্তে খালিহাতে নাড়াঘাঁটা করছেন, কাউন্টারে কাঁটা বিপদসীমা পেরিয়ে গেছে এমন জায়গায় বিন্দাস খালি পায়ে হেঁটে চলে গেলে বেড়াচ্ছেন, মাইনিং-এর ওয়েস্ট নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন, তখন তো তা শকিং হবেই। হ্যাঁ, সেই জায়গাটাই দ্বিতীয় সাক্ষাতের জাদুগোড়া। এই সাক্ষাতটি অনন্ত পটবর্ধনের 'ওয়ার আণ্ড পিস' আর শ্রীপ্রকাশের 'বুদ্ধ উইপ্স ইন জাদুগোড়া'র সৌজন্যে। শকের আরও হদ্দমুদ্দ হয়ে যায়, যখন দেখি লোকজনের এই চূড়ান্ত অসাবধানতার পিছনে রয়েছে,

না, ক্যাজুয়াল ডোন্ট কেয়ার মনোভাব নয়, বরং এ বিষয়ে সচেতনতার চরম অভাব। তেজস্ক্রিয়তা কী, খায় না মাথায় মাখে তাই জানেন না সেখানকার বেশির ভাগ মানুষজন। যাঁরা জানেন, তাঁরা জানেন না তার মাত্রা কত, তাঁরা 'এক্সপোজড' হচ্ছেন কি না। শক আসার অবশ্য আরও বাকি ছিল। যা দেখতে দেখতে দৃশ্যে দৃশ্যে সেলুকাসকে স্মরণ করা আশ্চর্যের নয়।

খনি থেকে ইউরেনিয়াম উত্তোলন ও ইয়েলো কেক তৈরির পরে যে বিপুল পরিমাণ বর্জ্য তৈরি হয়, তা ফেলা হয় একটা পুকুর কেটে— 'টেইলিং পন্ড'-এ। কিন্তু বর্জ্য মানেই তেজস্ক্রিয়তা থেকে মুক্ত, এমনটা একেবারেই নয়। কারণ জাদুগোড়ার খনিজ নিম্নমানের হলেও ১০০ শতাংশ নিষ্কাশন সম্ভব নয়, ইউরেনিয়ামের শতাংশ কম হলেও থাকে এবং চিন্তার বিষয় হল, টেইলিং পন্ডে বর্জ্যের ঘনত্ব অনেক বেশি। ইউরেনিয়ামের সঙ্গে সেখানে আছে রেডিয়াম, থোরিয়ামের মতো বেশ কিছু 'ডটার' নিউক্লেইড, যারা নিজেরাও তেজস্ক্রিয়, আছে বিক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত গামা রশ্মি ও তেজস্ক্রিয় রেডন গ্যাস। এই রেডন গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে, হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে বর্জ্যের তেজস্ক্রিয় ধূলিকণাও। টেইলিং পন্ডের তেজস্ক্রিয় কণারা মেশে জলে।

তথ্যচিত্রে দেখা গেল, সেই টেইলিং পন্ডের কাছ দিয়ে লোকজন দিব্বি হেঁটে যাচ্ছেন, সেখানে কাজকর্ম করছেন, গোরু চরাচ্ছেন, সেই টেইলিং পন্ডের কাছেই মানুষের বাড়িঘর, তার কাছে নালার জলে নিত্যি কাজকর্ম চলছে। কোনও বিধি নিষেধ নেই, থাকলেও তা নিতান্ত নাম কা ওয়াস্তে। একটা বোর্ড লাগানো ছিল, সেও কখন কে খুলে নিয়ে গেছে। দেখা গেল, ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মিল টেইলিং-এর পাথর, আঢাকা বা অর্ধ-ঢাকা অবস্থায়, সেই পাথর ট্রাকের ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার দু'ধারে ছড়িয়ে পড়ছে, আর তা তুলে নিয়ে এলাকার মানুষ বানাচ্ছেন ঘর, তেজস্ক্রিয় ঘর! নাঃ, এখানেও কেউ কিছু বলার জন্য নেই। কারণ, যাঁদের বলার কথা, সেই UCIL (Uranium Corporation of India Limited)-এর কার্যকর্তারা তো মুখের উপর অস্বীকারই করলেন যে, ও ভাবে ট্রাকে করে পাথর আদৌ নিয়ে যাওয়া হয়। বলা বাহুল্য, এই তথ্যচিত্রে (এবং পরবর্তীকালে 'আজ তক'-এর একটা তথ্যচিত্রে) এই ট্রাক থেকে পাথর পড়ার দৃশ্য আর অধিকর্তাদের বক্তব্য পাশাপাশিই রাখা ছিল।

ইন্টারন্যাশানাল ডক্টরস ফর পিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী, খনি ও টেইলিং পন্ডের আশেপাশের আর দূরের গ্রামের মধ্যে তুলনা করলে কাছাকাছি গ্রামগুলিতে ক্যান্সার থেকে শুরু করে বিকলাঙ্গ শিশু জন্মানো, সবই বেশি, অন্তত ৫০ শতাংশ বেশি। ত্রুটি নিয়ে জন্মানো শিশুর মৃত্যুর হার অনেকগুণ বেশি। এর আগে হওয়া আরও কিছু সমীক্ষা এবং রিপোর্টও একই ছবি দেখায়, তার মধ্যে 'অণুমুক্তি'-র সমীক্ষা উল্লেখযোগ্য।

এনভায়রনমেন্ট কমিটির দাবি ছিল ৫ কিমি দূরত্বের মধ্যে কোনও সেটলমেন্ট রাখা চলবে না। UCIL-এর গাইডলাইন অনুযায়ী সেটা এক দেড় কিমি। আর বাস্তব? টেইলিং পন্ডের একেবারে পাশেই মানুষের ঘরবাড়ি, বসত—পন্ডের জন্য উৎখাত হওয়া মানুষজন পন্ডের তলাতেই ঘর বেঁধে আছেন। জাদুগোড়াতে গিয়ে মহিলা কমিশনের একটা টিম দেখে এসে সেরকমই রিপোর্ট দিয়েছিল।

ড. টিলম্যান রাফ, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)-এর অস্ট্রেলিয়ান হেড ও নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী সংস্থা International Physicians for Prevention of Nuclear War (IPPNW)-এর বোর্ড অব ডায়রেক্টরসের সদস্য এবং জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ রিঅ্যাক্টর ইন্সটিটিউটের প্রফেসর হিরাওকি কোইদে বলেছেন, ''nowhere is human settlement so perliously close to the mines of the Uranium Corporation of India as in Jadugoda, casting severe health and environmental impacts''

শ্রীপ্রকাশজীর তথ্যচিত্র দেখিয়েছিল, ওখানে কিছু সচেতন মানুষ এসবের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন, সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন, JOAR (Jharkhandis' Organisation Against Radiation)-এর ব্যানারের তলায়। দাবি ছিল, সুরক্ষিত ভাবে, আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড মেনে খননকার্য করতে হবে, নতুন ভাবে কোনও খনিতে আর কাজ শুরু করা চলবে না, এই খননকার্যের ফলে স্বাস্থ্যের যে ক্ষতি হয়েছে তার যথাযথ খতিয়ান তৈরি করতে হবে এবং তার জন্য দায় নিতে হবে ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, খনি আর টেইলিং পন্ডের কাছাকাছি লোকজনকে দূরে কোথাও পুনর্বাসন দিতে হবে।

কতদূর গেল তাঁদের আন্দোলন? কিছু পরিবর্তন এল?

সে সব দেখতে শুনতেই জাদুগোড়া যাওয়া।

গন্তব্য জাদুগোড়া

হ্যাঁ, দেখা গেল, টেইলিং পন্ডের চারিদিকে বেড়া লেগেছে বটে। নিষিদ্ধ এলাকা বলে একখানা বোর্ডও দাঁড়িয়ে আছে বটে। তবে কি না গেটখানিও দিব্বি খোলা এবং ভিতরে, হ্যাঁ, সেই একই দৃশ্য, একগাদা বাচ্চা খেলা করছে। পাহারা? না, নেই।

হ্যাঁ, দেখা গেল ডাম্পারে করে টেইলিং নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তার উপরে ত্রিপলের ছাউনি পড়ছে বটে। কিন্তু সেই ছাউনি দিচ্ছেন একজন শ্রমিক। গ্লাভস, বুট বা অন্য কোনও প্রোটেকশন? না, নেই।

তবে, পরিবর্তন এসেছে বটে, এই ক' বছরে JOAR-এর শক্তি ক্রমশ কমেছে। কমেছে সব রকম প্রতিবাদের তীব্রতা ও সংখ্যা। বলা ভালো, কমানো হয়েছে। কমিয়েছে, UCIL। এরকমই অভিযোগ JOAR-এর এখনকার লোকজনের। কমিয়েছে UCIL-এ চাকরির টোপ দিয়ে, পেটের দোহাই পেড়ে। স্থানীয় মানুষজনকে বুঝিয়েছে, এখানে এই সব আন্দোলন করা মানে নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারা। বলেছে, আন্দোলন থেকে সরে এলে তাঁদের চাকরি দেওয়া হবে। মানুষ সরে এসেছেনও।

তেজস্ক্রিয়তার কুফল নিয়ে তাঁদের তো সচেতন, সতর্ক করা হয়ইনি, বরং উলটো ক্যাম্পেনিং বা বলা ভালো, প্রোপাগান্ডা চালানো হয়েছে যে, ইউরিনিয়াম মাইনিং জাদুগোড়াতে কোনও সমস্যাই নয়। সাহায্য করেনি কোনও রাজনৈতিক দলও।

ঘনশ্যাম বিরুলি ছবি দেখাচ্ছিলেন, বাচ্চা বাচ্চা ছেলেপুলেদের হাতে ব্যানার, তাতে লেখা আছে, পেটের সমস্যার কাছে প্রদূষণ কোনও সমস্যাই নয়। UCIL পেটের সমস্যা মেটাচ্ছে, অতএব প্রদূষণের চিন্তা করার কোনও দরকার নেই ইত্যাদি। এই সব ব্যানার নিয়ে UCIL-এর প্ররোচনায় স্থানীয় মানুষজন হামলা করেছিলেন JOAR-এর লোকজনের উপর, ২০০৭ সালে খনির লিজ বাড়ানো নিয়ে যখন জনশুনানি হল। সেই শুনানিতে JOAR-এর লোকজনকে কোনও বক্তব্যই রাখতে দেওয়া হল না, বিনা বাধায় লিজ বেড়ে গেল। তেজস্ক্রিয়তা-জনিত স্বাস্থ্যের সমস্যা, ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন কিছু নিয়েই কোনও কথা হল না। স্থানীয় মানুষজন বুঝলেনও না, নিজেদের পায়ে আসল কুড়ুলটা আসলে তাঁরা এ ভাবেই মেরে ফেললেন, বলছিলেন ঘনশ্যাম।

কেন মানুষ ভাবছেন না?

আসলে তেজস্ক্রিয়তাজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা তো এই জল খেলাম, তার থেকে পেট খারাপ হল, এই রকম স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ ভাবে বোঝার মতো সমস্যা নয়, সেটা বুঝতে ও বোঝাতে গেলে প্রয়োজন সচেতনতা, যার একান্ত অভাব। আর জীবিকার নিরাপত্তার ঘেরাটোপের টোপ বড়ো লোভনীয় ফাঁদ, সচেতনতার অভাবের সঙ্গে যুক্ত হলে তা দিব্বি ভুলিয়ে দিতে পারে যে, সাময়িক ভাবে পেট ভরাতে গিয়ে আসলে খুইয়ে ফেলতে হচ্ছে সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকতে অধিকার, ভুলিয়ে দিতে পারে ইতিহাস— যে জমির খনিতে UCIL আজ জীবিকা দিচ্ছে বা দেবার কথা বলছে, সে জমি আসলে তাঁদের নিজেদেরই ছিল, সেই জমি তাঁদের পেট ভরাত। ভুলিয়ে দিতে পারে সেই

সব মানুষের কথা, যাঁদের ওই জমি থেকে উৎখাত করার পর আজও ন্যায্য ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন বা চাকরি দেয়নি UCIL; ভুলিয়ে দিতে পারে, এই আন্দোলন হয়েছে বলেই একের পর এক টেইলিং পন্ড তৈরির সময় হওয়া উৎখাত হওয়া মানুষ চাকরি পেয়েছেন। পেয়েছেন অন্তত কিছুটা হলেও সুরক্ষা ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা।

সবাই অবশ্য ভুলতে পারেন না। যেমন পারেননি এই ঘনশ্যাম বিরুলি। সেই আশির দশকের গোড়ার দিকে UCIL-এ পাকা চাকরির আশ্বাস পেয়েও, শিক্ষানবিশি করতে করতেও ভুলতে পারেননি যে, তাঁর বাবা, ইউরেনিয়াম খনির এক শ্রমিক, যখন ফুসফুসের ক্যানসারে মারা যান, তখন তাঁর বয়স মাত্র ৪২। মা-ও মারা যান কয়েক বছরের মধ্যেই। লাইব্রেরিতে নিয়ে আসা বইয়ে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ক্ষতিকর মারণ প্রভাবের কথা পড়তে পড়তে চমকে ওঠেন ঘনশ্যাম। তাঁদের জাদুগোড়াতেও তো এই সব লক্ষণই দেখা যায়! চমকে ওঠেন বিকিরণ ঠেকাতে সাবধানতার কথা পড়তে পড়তে। কই, তাঁদের জাদুগোড়ায় তো এ সব কিছু ব্যবস্থাই নেওয়া হয় না। খনিতে সেরকম কোনও প্রোটেকশন ছাড়াই বাবাকে কাজ করতে হত, খনির পোশাক পরেই বাবা ঘরে চলে আসতেন, সেটাই রেওয়াজ ছিল, সেই পোশাক কাচতেন মা। ক্যানসার বা বিকলাঙ্গ শিশু জন্মানো— কই আগে তো এ সব এত বেশি ছিল না! যখন এই সব রোগ এখানে বেশি হতে শুরু করল, লোকজন ভাবলেন এ বুঝি ডাইন-ভূতের উৎপাত শুরু হয়েছে। কিন্তু ঘনশ্যাম এবং আরও কয়েকজন অন্য রকম ভেবেছিলেন। এই ভাবনা থেকেই আন্দোলনের শুরু, সেই আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। হ্যাঁ, দাবিদাওয়া মতো অনেক কিছুই পাননি, কিন্তু খনির পোশাক পরিবর্তন করে, স্নান সেরে আসার নিয়ম চালু হওয়া কি, টেইলিং পন্ডের এলাকা ফেন্সিং, ডাম্পারে ত্রিপলের ঢাকা দেওয়া, এগুলো যথেষ্ট না হলেও হয়তো কিছু পাওনা।

বিপদের শেষ নেই

শুধু তেজস্ক্রিয়তাজনিত সমস্যাই নয়, এখানে চলতে পারে রাসায়নিক বিষক্রিয়াও, যা অনেক সময় তেজস্ক্রিয়তার থেকেও বড়ো সমস্যা হতে পারে। খনিজ ইউরেনিয়াম হল মূলত ইউরেনিয়ামের অক্সাইড। জলে মিশে থাকা অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলেই জারিত হয়ে জলে গুলে যায় এই ইউরেনিয়াম ও জলের বাইকার্বনেটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তৈরি করে স্টেবল ইউরেনিল-কার্বোনেটো যৌগ। ফলে একবার জারিত হলে ইউরেনিয়ামের জলে গুলে যাওয়ার প্রবণতা অনেক অনেক বেড়ে যায়। খনিজ ইউরেনিয়ামের ছোঁয়াচ লাগা জল— যাতে মিশে থাকে এই রাসায়নিক— এক সময় মেশে ভূগর্ভের জলের সঙ্গে। যেখানে যেখানে এই জল পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার হয়, সেখানে ইউরেনিয়াম আসে জল থেকে শরীরে। ক্যানসারের সম্ভাবনা বাড়ে, বেশিমাত্রায় গেলে কিডনির অসুখ অবধারিত---বলছিলেন বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-গবেষক অনির্বাণ বসু।

শুধু ইউরেনিয়ামই নয়, প্রায় সবক্ষেত্রেই ভূতাত্ত্বিক কারণে ইউরেনিয়াম আকরিকের মধ্যে অনেক ভারী ধাতু মিশে থাকে। কোটি কোটি বছরের পুরনো আকরিকে সব থেকে বেশি থাকার সম্ভাবনা হল লেড, কারণ রেডিওঅ্যাকটিভ ইউরেনিয়াম বিভাজিত হতে হতে শেষকালে লেডে রূপান্তরিত হয়। এছাড়াও থাকতে পারে নিকেল, ক্যাডমিয়াম, কোবাল্ট জাতীয় ভারী ধাতু। যদি সেডিমেন্টারি খনিজ হয় তা হলে থাকে সেলেনিয়াম (অতিরিক্ত মাত্রায় যা খুবই ক্ষতিকর), মলিবডিনাম ও আর্সেনিক (মোট ওজনের ১০ শতাংশ অবধি)। একই ভাবে এই সব ভারী ধাতু ও অন্যান্য অধাতুও জলে মিশে যেতে পারে, যদি জল কোনও ভাবে আকরিকের সংস্পর্শে আসে। আরও সমস্যা হল জলে মিশে থাকা ইউরেনিয়াম ও ক্ষতিকর ভারী ধাতুগুলো সহজেই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যায় ভূগর্ভের জলের সঙ্গে। ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই দূষণ ছড়িয়ে পড়ে আরও দূরে। আজকে যেখানে সমস্যা নেই— কয়েক দশক পর সেখানকার জল দূষিত হয়ে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যেতে পারে। যেমনটা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানকার ৩৬টি রাজ্যে ১২০টা জায়গায় ভূগর্ভের জলে ইউরেনিয়ামজনিত দূষণ ধরা পড়েছে— যার অন্যতম কারণ হল খনি থেকে আকরিক তোলা ও সেই প্রক্রিয়ায় যা বর্জ্য তৈরি হয় সেই জমানো বর্জ্য জলে মিশে ছড়িয়ে পড়া। সারা পৃথিবীতে এই বর্জ্যের পরিমাণ প্রায় হাজার মিলিয়ন ঘনমিটার, বলছিলেন অনির্বাণ। এবং সেটা সত্যি হলে তা বিকিরণজনিত ক্ষতির চেয়েও ভয়ঙ্কর হবে। ইতিমধ্যেই একটা স্টাডিতে দেখানো হয়েছে, জাদুগোড়ার জলে এই সব ভারী ধাতুর পরিমাণ যথেষ্ট বেশি। জলে ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম ও ভারী ধাতুর পরিমাণ নিয়ে যা সব স্টাডি হয়েছে, তা অপ্রতুল, আরও পরীক্ষা

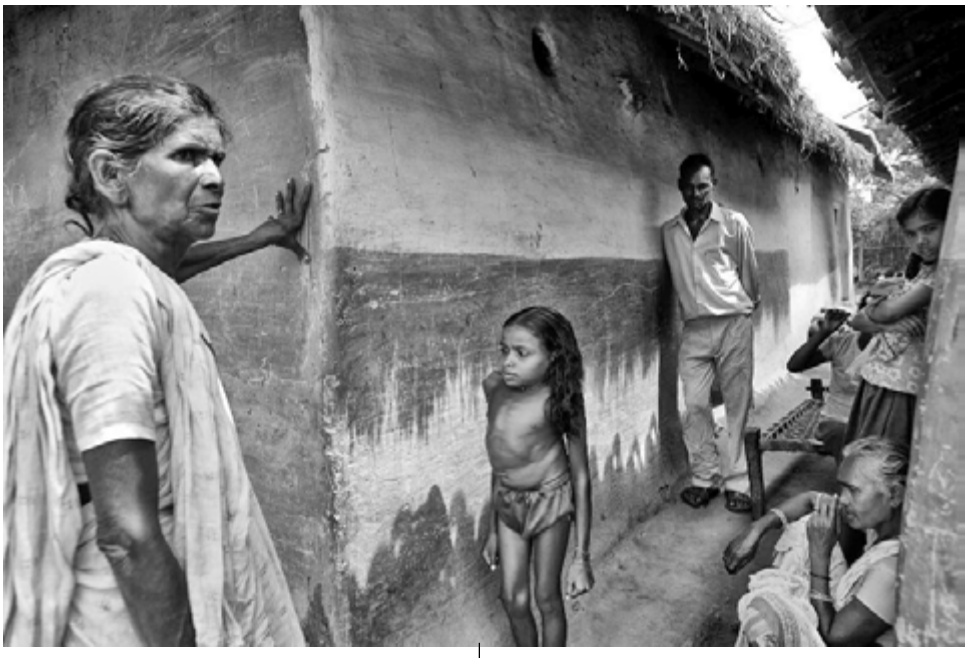

নিরীক্ষা করার প্রয়োজন। প্রয়োজন অবিলম্বে বিকিরণের পরিমাপ করা এবং কিছু স্বাস্থ্য সমীক্ষারও। UCIL ও বার্কের বিজ্ঞানীদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে এই অঞ্চলে কোনও বিকিরণজনিত, জলে ইউরেনিয়াম-জনিত বা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা নেই। যে সব স্বাস্থ্য সমীক্ষায় সমস্যার কথা উঠে এসেছে, তাকে সরকার কোনও মান্যতা দিতে চায় না। যদিও গত বছরে প্রকাশিত সরকারি সংস্থার একটা স্বাস্থ্য সমীক্ষায় আরও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে।

সরকারি বিজ্ঞান সরকারি চিকিৎসা— কতদূর ভরসা রাখা যায়?

এদিকে সরকারি গবেষণালব্ধ দাবির কথা মানতে চান না স্থানীয় অ্যাক্টিভিস্ট বা অনেক বিজ্ঞানী। জাপানি বিজ্ঞানী হিরাওকি কোইডের পরিমাপ করা বিকিরণের সঙ্গে বার্কের বিজ্ঞানীদের হিসেব মেলে না। জলে ইউরেনিয়ামের পরিমাণ ও ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে সেটা সরানো সংক্রান্ত সরকারি গবেষণা নিয়েও অনেক প্রশ্ন রয়েছে। পারস্পরিক অবিশ্বাসের এই চাপান-উতোরের মধ্যে সত্যিটা কোথায় অবস্থান করছে? সত্যি সত্যি কেমন আছে জাদুগোড়া? জানতে গেলে প্রয়োজন সর্বজনগ্রাহ্য কোনও স্টাডি টিম তৈরি করে নিরপেক্ষ ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা। অতি সম্প্রতি রাঁচি হাইকোর্টে একটা পিআইএল-এর ভিত্তিতে আদালত UCIL-এর কাছে এই সব বিষয়ে উত্তর চেয়েছে এবং যা উত্তর পেয়েছে তা আদালতকে এখনও সন্তুষ্ট করেনি।

২০০৬ থেকে ২০০৮-এর মধ্যে এখানে ঘটে গেছে অন্তত চারখানি পাইপ লিকেজ জনিত দুর্ঘটনা। মিল টেইলিং ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে, এমন কি কিছু বাড়িরও কাছে। RTI-এর উত্তরে UCIL স্বীকার করেছে, অসতর্কতা, অবহেলা ও মেন্টেইন্যান্স সমস্যার জন্য এগুলো হয়েছে। কিন্তু এই শুকনো স্বীকারোক্তির কী বা দাম আছে? এগুলোর জন্য ওখানকার মানুষদের কী দাম চোকাতে হচ্ছে বা হবে, তার কি কোনও হিসেব আছে? প্রতিশ্রুতি মতন নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরিতকরণ, তাও করা হয়নি। এখনকার দুর্ঘটনাগুলিতে তাও কিছু সাবধানতা সহ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটেছে তার আগেও, আর তখন কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি— জানালেন JOAR-এর লোকজন। তার জন্য যা ক্ষতি হয়ে গেছে, তার হিসেব কে মেলাবে? বেশ কয়েকটা স্টাডিতে এখন প্রমাণিত, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকোতে খনির কর্মীদের মধ্যে ক্যানসার ও নিউমোকোনিওসিস জাতীয় রোগ অনেক বেশি আর এই অসুস্থতাকে 'রেডন প্রজেনি'-র বিকিরণজনিত কারণের সঙ্গেই সংযুক্ত করা হয়েছে। জাদুগোড়াতে ছবিটা কী রকম?

না, ঘনশ্যামের বাবা বা তাঁর মতো আরও যে সব খনি শ্রমিকদের ক্যানসারে মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের মৃত্যুর কারণ নিয়ে কোনও গবেষণা এদেশে হয়নি। করার প্রয়োজনীয়তাই বোধ হয় বোধ করা হয়নি।

তথ্যচিত্র বা আগের সমীক্ষাতে যাঁদের কথা জানা গেছিল, অসুস্থ বলে, এখন তাঁদের প্রায় সবাই মৃত, বলছিলেন ঘনশ্যাম। যে বিকলাঙ্গ শিশুদের দেখা পাওয়া গেছিল তারাও প্রায় কেউই আর বাঁচেনি। এখন আর বিকলাঙ্গ শিশুদের আর তত দেখা পাওয়া যায় না, কারণ শিশুরা এখন জন্মায়ই না কিংবা জন্মালেও মৃত জন্মায়। অনেক মহিলা এখন বন্ধ্যাত্বে ভুগছেন কিংবা প্রথম সন্তান মৃত প্রসব করছেন। দয়ামনি বার্লা তাঁর প্রতিবেদনে এরকম বহু মেয়ের কথা লিখেছেন, যাঁরা মহিলা কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন যে তাঁদের সন্তান হচ্ছে না, হলেও মৃত বা অসুস্থ সন্তান জন্মাচ্ছে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে আমরাও যা দেখলাম, শুনলাম, তা ওঁদের কথারই প্রতিধ্বনি। বেরিয়ে এল আরও কিছু কথা। এই যেমন, ঘরে ঘরে 'টিবি',

মানে হাসপাতাল থেকে যাকে টিবি বলেই চিহ্নিত করে, ওষুধও দেয়, যদিও UCIL-এ চাকরি না করলে সে চিকিৎসা করাতে ছুটতে হয় ১৫ কিমি দূরে সরকারি হাসপাতালে বা গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে বেসরকারি হাসপাতালে। সেই টিবিতে ঘরে ঘরে মৃত্যু। বনবিহারীর মতো কারও কারও কোনও কোনও ঘরে প্রায় সবাই চলে গেছেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ একুশ, আটাশ, তিরিশেই, মারা যাচ্ছেন। টিবিতেই তো? সন্দেহ প্রকাশ করলেন শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের ডা. পুণ্যব্রত গুণ। রোগীদের দেখে বললেন, এই ধরনের লক্ষণ টিবি ছাড়াও ফুসফুসের ক্যানসার থেকে হতে পারে, হতে পারে পালমোনারি নিউমোকোনিওসিস থেকেও, যা খনি শ্রমিকদের হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সেই অর্থে সেভাবে অপুষ্টিতেও ভোগেন না এখানকার মানুষজন, যা এত বেশি টিবি কেস নিয়ে আরও প্রশ্নচিহ্ন তুলে দেয়। এছাড়া নিউমোকোনিওসিসও বহু ক্ষেত্রে টিবির রিস্ক বাড়িয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ টিবি হলেও তা খনির দূষণজনিত কারণেই হতে পারে।

এর আগেও 'অণুমুক্তি'র তরফে হওয়া সমীক্ষাতেও অস্বাভাবিক রকমের বেশি টিবি ও কম সংখ্যা ক্যানসার কেস দেখে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছিল। ইউরেনিয়াম দূষণের উপর দোষ পড়বে বলে ক্যানসারের কেসগুলিকে টিবি

বলে চালানো হতে পারে, এই আশঙ্কা ব্যক্ত করা হয়েছিল। এই রোগগুলির সঠিক চিহ্নিতকরণ, সেই মতো যথাযথ চিকিৎসা হওয়ার ভীষণ ভাবেই প্রয়োজন। প্রয়োজন আগ্নু মুর্মু বা শ্রীপতি পাত্রদের মতো রোগীদেরও সঠিক ভাবে পরীক্ষা করা, যাঁদের অতি অস্বাভাবিক ভাবে হাত পা সব শুকিয়ে যাচ্ছে, যাঁরা অথর্ব হয়ে পড়ছেন মাত্র ২৭-২৮ বছর বয়সেই। কী রোগে ধরেছে এঁদের? প্যারাপ্লেজিয়া, ওয়েস্টিং অফ মাসল—রেডিয়েশন বা কেমিক্যাল টক্সিসিটি-জনিত স্নায়বিক রোগ নয়তো? রোগীদের দেখে সেই সন্দেহ উড়িয়ে দিতে পারলেন না ডা. গুণ। সেই সন্দেহ আরও গাঢ় হয়, ওঁদের কথা শুনে। খাটে শুয়ে শুয়ে কাঁদতে কাঁদতে আগ্নু বলছিলেন তাঁর যন্ত্রণার কথা, বলছিলেন ছোটোবেলায় তাঁরা কেমন ফুটবল খেলতে যেতেন ওই টেলিং পন্ডের ধারের শক্ত হয়ে যাওয়া জমির উপরে। ওই জল মুখে চোখে দিতেন, ওই জলের মাছ ধরে নিয়ে এসে খেতেন। না, কেউ তাঁদের বারণ করেনি। তখন বিকিরণ বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব সম্বন্ধেই জানা ছিল না তাঁদের। একই কথা বলছিলেন মাত্র তিরিশ বছর বয়সে মস্তিষ্কের টিউমারে আক্রান্ত মানুষটাও। চিকিৎসা করতে গিয়ে আজ জমি-জীবিকা সব হারানো বিপর্যস্ত বিষণ্ণ পরিবারের দেওয়ালে টাঙানো সবল স্বাস্থ্যবান এক তরুণের হাস্যমুখ সস্ত্রীক ছবিটার অস্তিত্ব বড়ো অস্বস্তিজনক। অস্বস্তিজনক বাবুলালকে হাসি মুখে বসে থাকতে দেখাও। বয়স হয়ে গেলেও যার বুদ্ধি বাড়েনি। শরীরের অঙ্গও বিকৃত। অস্বস্তি লাগে এ রকম আরও অনেককে দেখতেই।

কিন্তু শুধু অস্বস্তিকরই নয়, আমাদের এই দেখাগুলো অসম্পূর্ণও। এই খণ্ড পর্যবেক্ষণগুলো, ওখানকার মানুষের অভিজ্ঞতা-অভিযোগগুলো আরও মনোযোগের দাবি করে। কিছু কিছু রোগ কি এই ইউরেনিয়াম খনি অঞ্চলে অন্যান্য জায়গার থেকে সত্যিই বেশি বা এমন কিছু রোগ কি হচ্ছে যা অন্যত্র দেখা যায় না? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া জরুরি, আর সে উত্তর সিস্টেমেটিক ও পুরো এলাকাভিত্তিক সমীক্ষা, ঠিকঠাক কন্ট্রোল নিয়ে বিশ্লেষণ এবং স্বাস্থ্য ক্যাম্প ব্যতীত পাওয়া সম্ভব নয়। এবং সে সমীক্ষা হতে হবে সকলের আস্থা ও বিশ্বাসভাজন কোনও নিরপেক্ষ বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক দলের দ্বারা। ক্যাম্প ও সমীক্ষা করার প্রয়োজন, হ্যাঁ খুবই বেশি মাত্রায় প্রয়োজন, অস্থায়ী ঠিকা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিয়েও, সেই ঠিকা শ্রমিক, যাঁদের কয়েকজনকে আমরা দেখেছিলাম, খালি হাতে ডাম্পারের মাইন টেইলিং-এর উপর ত্রিপল বাঁধতে। দেখা হয়েছিল রিষি পিঙ্গুয়ার সঙ্গেও। অল্পবয়সী এই অস্থায়ী শ্রমিকের সারা শরীর ফুলে যাচ্ছে, হাতে ব্যথা, ফোলা। আর কাজে যেতে পারেন না। যেহেতু ঠিকা শ্রমিক, তাই চিকিৎসার কোনও দায়িত্বও UCIL নেয় না। স্থানীয় ক্লিনিক, যা মূলত হাতুড়ে ডাক্তাররা চালান, সেখানে দেখিয়েছেন। প্রেসক্রিপশন থেকে দেখা গেল, স্টেরয়েড দেওয়া হয়েছে। ইনি পাইপলাইনের কাজ করতেন। না, গ্লাভস কোনও দিনও পরেননি, কেউই দেয়নি। জাদুগোড়া জুড়ে এখন ঠিকাদারদের রমরমা। তার একটা বড়ো কারণ, ঠিকা শ্রমিকদের অনেক কম মাইনে দিয়ে বেশি কাজ করানো যায়, আর তাদের নিয়ে UCIL-এর কোনও দায় নেওয়ার প্রয়োজন থাকছে না। আরও কারণও আছে। এইসব আদিবাসী শ্রমিককে নিয়ে আসা হয় দূরদূরান্ত থেকে, কারণ এলাকার মানুষজন কিছুটা সচেতন হয়ে যে 'বিপজ্জনক' কাজগুলো করতে চান না, সেগুলো করানোর জন্য এই নিয়ে অনেক কম সচেতন, পেটের দায়ে অনেক বেশি জর্জরিত ঠিকা শ্রমিকরাই তো আদর্শ। এবং সেই সব

কাজে এঁদের সুরক্ষার পিছনে ব্যয় ও দায় ন্যূনতম বলেই অভিযোগ করলেন ঠিকা শ্রমিকেরা এবং JOAR-এর লোকজন। ঠিকা কাজের পর এঁরা কোন মারণ বিকিরণের কত পরিমাণ দেহে বহন করে কোথায় গেলেন, বাঁচলেন না মরলেন, সে ঠিকানা কেউই রাখে না। কেন এতটা অবহেলা? কেন জাদুগোড়ার মানুষজনের প্রতি এতটা অবহেলা, প্রশ্ন তোলেন দুমকা মুরমু, JOAR-এর সেক্রেটারি, প্রশ্ন তোলেন, তাঁরা আদিবাসী বলেই কি এই অবহেলা? শুধু অবহেলাই তো নয়, এ রীতিমতন অন্যায়ও নয় কি? একদল মানুষের জীবনের, স্বাস্থ্যের মূল্যে 'উন্নয়ন' নয় কি? 'রাষ্ট্রহিত ' করতে গিয়ে তবে কি আমরা 'জনহিত'-কেই ভুলে যাব? প্রশ্ন তোলেন দুমকা, প্রশ্ন তোলা হয় তথ্যচিত্রে।

এ প্রশ্ন শুধু জাদুগোড়ারই নয়, 'উন্নয়ন' এর যূপকাষ্ঠে রাষ্ট্রে আদি বাসিন্দাদের এই বলিদান হয়েছে সর্বত্রই। শুধু ইউরেনিয়াম মাইনিং-এর কথা ধরলেই দেখা যাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্ট্রেলিয়া, মাইনিং-এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সেই আদি জনজাতিরাই, দূষিত হয়েছে তাঁদেরই বসতজমি, জল, হাওয়া।

ইউরেনিয়াম খনি শ্রমিকদের দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া ও অকালে মৃত্যুবরণ যে খননকার্যের কারণেই হচ্ছে, তা গবেষকরা প্রমাণ করে দিয়েছেন। আজও তেজস্ক্রিয় ও রাসায়নিক বর্জ্য নিয়ে ঠিক কী করা যায়, তা থেকে হওয়া দূষণের প্রতিকার কী ভাবে করা যায়, পরিত্যক্ত খনি থেকে ছড়ানো দূষণের মোকাবিলা কী ভাবে করা যায়, সে প্রশ্নের সঠিক উত্তর মেলেনি, বা যে সমাধান পাওয়া গেছে তা বহু ব্যয় ও পরিশ্রমসাধ্য। তাই প্রশ্ন উঠে যায় পারমাণবিক বিদ্যুতের ব্যবহার নিয়েই। পারমাণবিক চুল্লির নানাবিধ বিপদ তো আছেই, কিন্তু শুরুতেই, উত্তোলন প্রক্রিয়াই যেখানে এতজন মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে, সেখানে এর পরেও পারমাণবিক বিদ্যুতের সম্প্রসারণ হয়ে চলবে? এর পিছনে নতুন করে অর্থ ব্যয় না করে আমরা কম ক্ষতিকর পুনর্নবীকরণযোগ্য বিকল্প শক্তির উৎস নিয়ে ভাববো না? ভাববো না, আমাদের মাত্রাতিরিক্ত চাহিদায় লাগাম পরানোর সময় এসেছে?

'প্রকৃত' উন্নয়ন, দীর্ঘমেয়াদি (sustainable) উন্নয়ন নিয়ে এ হয়তো ক্লিশে হয়ে যাওয়া বিতর্ক, প্রশ্নগুলোও হয়তো সহজই। কিন্তু উত্তর কি জানা আছে?

লেখক পরিচিতি : ড. ঈপ্সিতা পাল ভৌমিক জনস্বাস্থ্য গবেষক ও গণস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মী। *গুরুচণ্ডা৯* পত্রিকার সংগঠক।

ADVERTISEMENT

With Best compliments from

Alteus Biogenics Pvt. Ltd.

Regd. Office : 18/61B Dover Lane, Kolkata - 700 029

Phone : 033 2486-7885 / 8087

Head Office : 14-B, Dover Lane, 1st Floor, Kolkata - 700 029

ক্যুইজ

মদ্যপান ও লিভারের অসুখ

অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে যেসব যকৃতের পীড়া হয়, সেগুলোকে এক সঙ্গে অ্যালকোহলজনিত লিভারের অসুখ বলে। যেমন ফ্যাটি লিভার, অ্যালকোহলজনিত হেপাটাইটিস, হেপাটিক ফাইব্রোসিস সহ দীর্ঘমেয়াদি হেপাটাটিটিস ও সিরোসিস। এই সব ডাক্তারি কথার বাংলা পরিভাষা আছে, কিন্তু সেগুলো আরও অপরিচিত, ফলে সেগুলো আর ব্যবহার করলাম না।

পশ্চিমি দেশগুলোয় মদ্যপান লিভারের রোগের বড় কারণ। অনেক দিন ধরে অনেক মদ খেলে ফ্যাটি লিভার সবার হয়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি হেপাটাইটিস বা সিরোসিস এঁদের সবার হয় না— বহু দিন ধরে অনেক মদ খাচ্ছেন যাঁরা তাঁদেরও শতকরা মোটামুটি ১৫-২০ জনের এই সব গুরুতর রোগ হয়।

আমরা মদ খেলে সেই মদের শতকরা ৮০ ভাগই লিভারে গিয়ে বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় নির্বিষকরণ (detoxification) হয়। বহু দিন ধরে অনেক মদ খেলে লিভারে প্রদাহ (inflammation) ঘটানোর মতো নানা কেমিক্যাল (সাইটোকাইনস, যেমন TNF-alpha, Interleukin 6 [IL6] ও Interleukin 8 [IL8]) নির্গত হয়। এছাড়াও লিভারে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস হয়। এগুলো জটিল ব্যাপার, কিন্তু মোদ্দা কথাটা হল, এর ফলে লিভারে প্রদাহ, কোষমৃত্যু, এবং শক্ত তন্তুময় কলা দিয়ে মৃত কোষের জায়গা পূরণ—এই সব হয়। কিন্তু লিভারের কাজ চালিয়ে যাওয়ার রিজার্ভ ক্ষমতা খুব বেশি। তাই লিভারের কোষের শতকরা ৭৫ ভাগের মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত লিভারের কাজ ঠিকঠাকই চলে।

কি ছু প রি সং খ্যা ন

প্রতি বছর ২৫ লক্ষ মানুষ অ্যালকোহল-জনিত কারণে মারা যান। বিশ্বের মোট মৃত্যুর শতকরা ৩.৮ ভাগ হল অ্যালকোহলের জন্য।

অন্য দিকে, প্রতি পাঁচজন ভারতীয়ের মধ্যে একজনের লিভারের সমস্যা আছে।

প্রশ্ন :

১. বহু দিন ধরে অতিরিক্ত মদ্যপান করলে কী কী লিভার সংক্রান্ত রোগ হতে পারে?

২। কতটা অ্যালকোহল খেলে অ্যালকোহল-জনিত লিভারের অসুখ হতে পারে?

৩। অ্যালকোহল-জনিত লিভারের অসুখের কোনও স্টেজ পর্যন্ত পুরো নিরাময়যোগ্য?

৪। লিভারের রোগ হলে শরীরের কী কী গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতি হয়?

৫। লিভার সিরোসিসে লিভারকে কেমন দেখায়? অন্য কথায়, লিভারের কী কী গঠনগত অস্বাভাবিকত্ব থাকলে আমরা সিরোসিস বলি? এই অস্বাভাবিকত্বগুলো কি দূর করা যায়?

৬। অ্যালকোহল-জনিত লিভারে রোগের সবথেকে মারাত্মক জটিলতা কী হতে পারে?

৭। হেপাটিক এনকেফ্যালোপ্যাথির প্রধান লক্ষণগুলো কী কী?

৮। একজন দীর্ঘমেয়াদি মদ্যপায়ী তাঁর নিজের ফ্যাটি লিভার আছে কি না সেটা কোন কোন পরীক্ষার সাহায্যে বুঝতে পারবেন?

৯। অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ-এর কোন পর্যায়টা চিকিৎসার পক্ষে সব থেকে ক্রিটিক্যাল? কী ভাবে এই পর্যায়ে চিকিৎসা হয়?

১০। পশ্চিমবঙ্গে কোন বয়সের পরে মদ্যপান আইনসম্মত?

১১। লিভার সিরোসিস সনাক্ত করার সেরা পরীক্ষা কোন্‌টি?

[উত্তর: ৩৫ পাতায়]

এবারের ক্যুইজ তৈরি করেছেন **অভিষেক দাস,** পুণেতে মেডিকেল কলেজের ছাত্র।

ADVERTISEMENT

এখন **দু র্বা র ভা ব না** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুকমার্ক, মণীষা গ্রন্থালয়, বইচিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়), বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

যাঁরা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন— ১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৬।

অথবা ফোন করুন ০৯৬৭৪ ১৬২০৯৪ অথবা ০৩৩ ২৫৪৩ ৭৫৬০।